নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

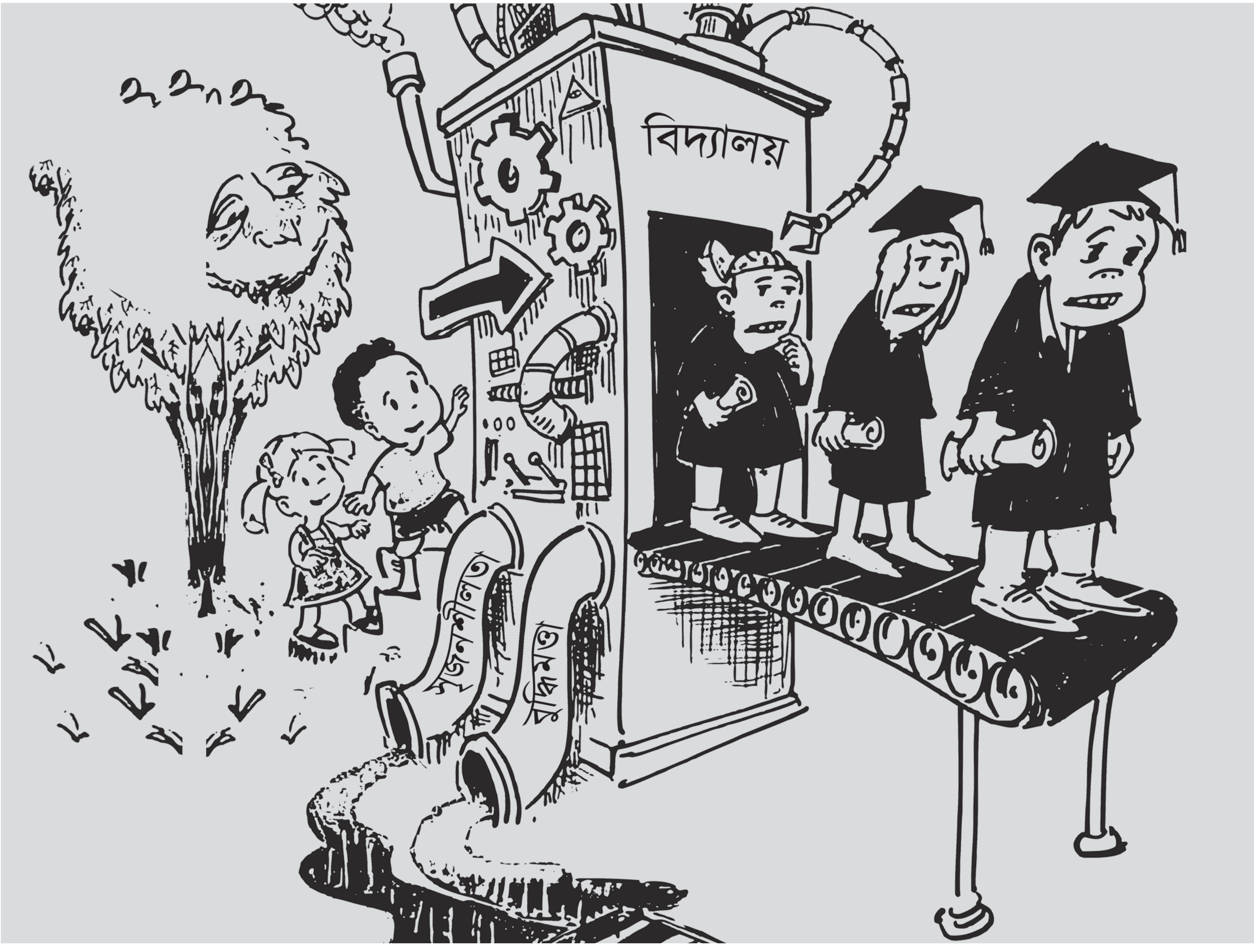

সংকলন ১৭। ■ সেপ্টেম্বর ২০২০

নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

সংকলন ১৭ । সেপ্টেম্বর ২০২০

সম্পাদকীয়

জীবন পাঠের শিক্ষা

বহু বছর আগে বঙ্গদেশে এক মহান পুরুষ তাঁর জীবনপাঠের গানের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষার ধারণা তুলে ধরেছিলেন। যা আজও সমাজে সমানভাবে শিক্ষার প্রাসঙ্গিক ধারাকে বহন করে। তিনি ছিলেন লালন সাঁইজি।

আত্মশক্তি ও আত্মজ্ঞান না থাকলে মানুষ হওয়া যায় না। শিক্ষার মূল বিষয় হচ্ছে 'নিজেকে জানা', কিন্তু প্রচলিত শিক্ষায় তা প্রায় নেই বললেই চলে। রয়েছে স্কুলগুলিকে জেলখানায় পর্যবসিত করার 'পাইপলাইন থিওরি' 'জাগ ও মগ থিওরি'। আজকের শিক্ষায় নিজেকে জানার বিষয়টি থাকলে মানবসভ্যতার ধারাবাহিকতায় মানুষ যেমন অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রকৃতিকে শাসন করে চলেছে তা হয়তো কখনও করত না। সামগ্রিক অগ্রগতির নেতৃত্বকে প্রযুক্তি আজ যেভাবে নিজের হাতে তুলে লাগামহীনভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে তা মানবসভ্যতার ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াতে হয়তো আর বেশি সময় লাগবে না। অন্যদিকে মানবিক জীবনকে শৃঙ্খলাময় করতে চালু থাকা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সফলতাও অনেকটা স্থুল, স্থবির, প্রাণহীন।

মানুষকে মানুষ করে তুলতে সাধারণ শিক্ষা বরাবর উদাসীন। গা ভাসিয়েছে দায়মুক্ত বাণিজ্যিক আধিপত্যে। মানুষ যেন বাজারের পণ্য। নিতান্ত উন্নত মস্তিষ্কের সামাজিক পশু হয়ে আজ আমরা মহাকালের গর্ভে আশ্রয়হীন প্রাণীর মতো বিচরণ করছি। নিজস্ব পরিচয় দেওয়ার মতো তেমন কিছু আজ আর অবশিষ্ট রয়েছে কি? আত্মপরিচয়টাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আত্মজ্ঞান ছাড়া আত্মদর্শন হয় না। আর আত্মদর্শন না হলে মানুষ পরম আত্মপরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞই থাকে। মানুষের দেহ-মনে রয়েছে সাতটি ইন্দ্রিয়দ্বার। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক, মুখ ও মনরূপে এই সাতটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয়রাশি হয়ে যা কিছু আমরা দেখতে পাই, শুনতে পাই, ঘ্রাণ পাই, স্বাদ পাই, স্পর্শ পাই, বলতে পারি ও অনুভূতি অনুভূত হয় তা আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। এগুলির মধ্য দিয়েই আমরা প্রকৃত শিক্ষার দোরগোড়ায় পৌঁছই।

সূচিপত্র

১। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত ২

২। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ৫

৩। মূল্যবোধের শিক্ষা ৬

৪। প্রকৃত শিক্ষা ৮

৫। শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি পর্যবেক্ষণেই কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজন ১০

৬। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে এসডিজি অর্জনের পূর্বশর্ত ১২

৭। *বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা* ঃ ১৩
জুলিয়াস কামবারাগে ন্যেরেরে

৮। *এসো তাঁদের গল্প শোনাই* ঃ ১৫
সত্যেন্দ্রনাথ বসু

৯। *সেই সময়* ঃ ১৬
নদিয়া

১০। শিক্ষা ও সংস্কৃতি......রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর........ ১৮

১১। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক শিক্ষিকার কথা........ ২০

১২। শিক্ষা সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকাঃ একজন মানুষের দূরদর্শীতার দলিল........ ২২

১৩। নতুন শিক্ষানীতি এবং বিদ্যালয় শিক্ষায় নতুন দিগন্তের সন্ধানে........ ২৪

১৪। নয়া শিক্ষানীতি (২০১৯)ঃ এক বিহঙ্গ দৃষ্টি আলোচনা দিব্যগোপাল ঘটক........ ২৫

১৫। নৈতিক শিক্ষা ২৬

১৬। প্রকৃতি আমাদের শেখায়, প্রকৃতি আমাদের বাঁচায় কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়........ ২৮

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত

স্যার কেন রবিনসন

এই নিবন্ধটি তৈরি হয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ স্যার কেন রবিনসনের ২০০৮ সালের জুন মাসে একটি ব্রিটিশ সংস্থা 'রয়্যাল সোসাইটি ফর দ্য এনকারেজমেন্ট অফ্ আর্ট, ম্যানুফ্যকচারারর্স অ্যান্ড কমার্স'-এ দেওয়া বক্তৃতার ভিত্তিতে।বিখ্যাত এই শিক্ষাবিদ্ই আর.এস. এ. বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন পুরস্কার পেয়েছিলেন।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ জনশিক্ষা সংস্কারের কাজে হাত লাগিয়েছে। এর কারণ দু'টি। প্রথম কারণটি হল অর্থনৈতিক। 'একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতিতে জায়গা পেতে ছেলেমেয়েদের কীভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন' মানুষ এটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। অথচ আমরা কীভাবে এমনটা করতে পারি, যেখানে আমরা অনুমানই করতে পারছি না যে আগামী সপ্তাহের শেষদিকে অর্থনীতিকে আমরা কী অবস্থায় দেখব? যেহেতু সম্প্রতি একটি গণ্ডগোলের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয়টি হল সাংস্কৃতিক। আমরা কীভাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তার ধারণা গড়ে দিতে পারি তা এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। বিশ্বায়ন পদ্ধতির শরিক হওয়ার সময় আমরা যাতে আমাদের সংস্কৃতির বীজটুকু তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারি সেইজন্যে কীভাবে আমরা এই বৃত্তটিকে চতুষ্কোণ করতে পারব? সমস্যাটা হল, তারা আগে কী করেছিলেন সেটা দিয়েই ভবিষ্যৎকে দেখার চেষ্টা করে চলেছেন। এইভাবে তারা লক্ষ লক্ষ শিশুদের এমনই বিক্ষুব্ধ করে তুলছেন যে, যেখানে এই সমস্ত শিশুরা স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যটুকুও খুঁজে পাচ্ছে না। আমরা যখন স্কুলে গিয়েছিলাম তখন এমন একটি গল্প আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল যে তুমি যদি কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ভালভাবে কলেজের একটি ডিগ্রি জোগার করে নিতে পার তাহলে তুমি একটি চাকরি পাবে। আমাদের শিশুরা এই ধারণায় বিশ্বাসী নয় এবং তারা যে এই পথে চলতে চায় না সেটাই ঠিক। কারণ এতে একটা ভাল ডিগ্রি জোগার করা ছাড়া তো অন্য কিছু করার কি কোনও গ্যারান্টি আছে? আর বিশেষত এই ডিগ্রি দিয়ে আমি যে ভাবছি একটি নির্দিষ্ট গতিপথে আমার নিজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবনাকে প্রতিফলিত করা যায়, তাও তো নয়। এই কারণে লোকেরা বলেন, যদি এটাকেই সফলতা হিসাবে ধরা হয়, তাহলে আমাদের মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে। বাস্তবিকই আপনি জানেন? হ্যাঁ! আমাদের জানা উচিত। কেন আপনি তাদেরকে নীচের সারিতে ফেলবেন? তাদেরকে নীচের দিকে নামানোর কোনও যুক্তিই আমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। কিন্তু তাদেরকে উপরের দিকে তুলে আনতে হবে। অবশ্যই আমাদের উচিত তাদেরকে উপরের সারিতে তুলে নিয়ে আসা।

শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি, রূপরেখা, কাঠামো একটি ভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সমস্যাটা এখানেই। বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত হওয়ার ধারণাকে এবং শিল্প বিপ্লবের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে এই শিক্ষা কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির আগে জনশিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই গড়ে ওঠেনি। বাস্তবিকই নয় ------------- যার মোদ্দা কথা হল, যদি তোমার অর্থ থাকে তাহলে তুমি ধর্মযাজক/পুরোহিতদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে পার। কিন্তু জনশিক্ষা হল এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে প্রত্যেকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে এবং এই শিক্ষাগ্রহণে কোনও অর্থের প্রয়োজন হবে না। জনসাধারণের প্রদেয় করের অর্থে এই শিক্ষা ব্যবস্থার খরচ চলবে। সত্যিই, এটা নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। অনেকেই এমন ব্যবস্থায় আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, ফুটপাতে বসবাসকারী শিশুদের এবং শ্রমজীবী মানুষের ছেলেমেয়েদের জনশিক্ষার সুবিধা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তারা লেখাপড়া করতে সমর্থ নয়। আমরা কেন মিছিমিছি তাদের জন্য সময় নষ্ট করতে যাব? তাই এর ভেতরেই সামাজিক কাঠামো এবং দক্ষতা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণায় গোটা বিষয়টিকে নির্মাণ করে ফেলা হয়। এটি আদতে সেই সময়ের আর্থিকভাবে ক্ষমতাশালী কর্তৃত্বের দ্বারা চালিত হয়েছিল। কিন্তু ঠিকভাবে চলতে চলতে এটাই বুদ্ধিজীবী মানসিকতার মডেল হয়ে উঠেছিল, যা ছিল মূলত বুদ্ধিমত্তার ধ্যান-ধারণাতেই আলোকিত। এই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার মধ্যে ছিল এক ধরনের ক্ষয়িষ্ণু যুক্তি এবং একটি যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতির জ্ঞানভাণ্ডার, যাকে কিনা আমরা প্রকৃতই শিক্ষাগত দক্ষতা হিসাবে ভেবে আসছি। বংশানুক্রমে চিহ্নিত জনশিক্ষার মধ্যে এমন ধারণাই গভীর যে এখানে দু'ধরনের লোকই বর্তমান–একদল শিক্ষানুরাগী, অন্যদল শিক্ষানুরাগী নয়, একদল চলনে বলনে চৌখস। অন্যরা সাদামাটা।

তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় দুটি স্তম্ভই বিদ্যমান–একটি অর্থনীতি, অপরটি বুদ্ধিজীবী। আমার মতে, এই মডেল (প্রতিরূপ) অনেক মানুষের জীবনে বিশৃঙ্খলা ডেকে এনেছে। কারো কারো কাছে এমন ধারণা বা দৃষ্টান্ত মহৎ, বিশেষত যারা এর থেকে আশ্চর্যজনকভাবে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই উপকারের পরিবর্তে কষ্টভোগ করছেন যেমন, আধুনিকতার ছোঁয়া

ছড়িয়ে পড়া–যা স্থানান্তর এবং অবাস্তবতার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা ‘এ. ডি. এইচ. ডি.-র মহামারী। এখন এটাই আমেরিকায় ‘এ. ডি. এইচ. ডি.-র উদাহরণের মানচিত্র বা ব্যবস্থাপত্র। আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি বলছি না যে মনোযোগের ঘাটতির কারণে বিশৃঙ্খলা হয় না (Attention deficit disorder)। সেখানে এমন কিছু আছে কিনা তা বলার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আমি যতদূর জানি, মনোবিদ্ ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের একটি বড় অংশই মনে করেন যে, সেখানে এরকম ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু এটা এখনও বিতর্কিত বিষয়। ঘটনাক্রমে আমি যতটা জানি তা হল, এটা ছোঁয়াচে নয়। এই শিশুগুলিকে এমনিতে নিয়মমাফিক ওষুধ দেওয়া হচ্ছে যেমন আমরা টনসিলের ক্ষেত্রে করে থাকি, একেবারেই ইচ্ছাকৃত এবং একই কারণে নিছকই চিকিৎসা আড়ম্বর।

আমাদের ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নিবিড় উত্তেজক সময়কালের মধ্যে বসবাস করছে। তাদেরকে তথ্য দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে কম্পিউটার, আইফোন, বিজ্ঞাপন প্রচারপত্র, শ’খানেক টেলিভিশন চ্যানেল প্রভৃতির উপর নজর রাখার জন্য বলপূর্বক বাধ্য করা হচ্ছে। আমরা এখন তাদেরকে শাস্তিপ্রদান করছি ভিন্নপথে চালিত হওয়ার জন্য। কোথা থেকে? বিশেষত স্কুলের একঘেঁয়েমি, বিরক্তিকর উপাদান থেকে। এটা আমার কাছে পুরোপুরিভাবে কোনও কাকতালীয় ব্যাপার নয়, যেখানে ‘এ. ডি. এইচ. ডি.-র উদাহরণগুলি সমান্তরালভাবে মান নির্ণায়ক পরীক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে উঠে আসছে। এখন এই সমস্ত ছেলেমেয়েদের রিটালিন এবং এডিরল দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে আলোর বৃত্তে নিয়ে আসতে এবং শান্ত করতে প্রায়শই সাংঘাতিক ড্রাগ প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু এই মতানুসারে যদি আপনি দেশের পূর্বপ্রান্তে ভ্রমণ করেন তাহলে মনোযোগের ঘাটতি জনিত বিশৃঙ্খলা (Attention deficit Disorder) যে বাড়ছে সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন। মানুষ ধীরে ধীরে ওকলাহামার উপর বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছে। তারা কদাচিৎ আরকানদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে এবং এই সময়ে তারা ওয়াশিংটনকে জানাতে চায় যে, তারা এটা পুরোপুরিভাবে হারিয়ে ফেলেছেন (আমি বিশ্বাস করি এটার পৃথক কারণও থাকতে পারে)। এটা কাল্পনিক মহামারী।

যদি এটাকে আপনি সাহিত্য শিল্পকলা হিসাবে ভাবনা চিন্তা করেন, আমি কিন্তু এটাকে পুরোপুরিভাবে শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে ফেলতে পারব না। আমি মনে করি, এটা বিজ্ঞান ও গণিতের সম্পর্কেও সত্য। কিন্তু আমি বিশেষত সাহিত্য শিল্পকলা সম্পর্কে বলি, কারণ তারা সম্প্রতি এধরনের মানসিকতার শিকার। সাহিত্য শিল্পকলা মূলত নান্দনিক অভিজ্ঞতার ধ্যান-ধারণাকে তুলে ধরে। নান্দনিক অভিজ্ঞতা হল এমনই এক ব্যাপার যেখানে আপনার ইন্দ্রিয়গুলি তাদের চূড়ায় উঠে কাজ করে, যখন আপনি সাম্প্রতিক মুহূর্তে উপস্থিত থাকেন, যখন আপনি আপনার অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের উত্তেজনায় বারবার সাড়া দেন, যখন আপনি জীবন্ত থাকেন। নান্দনিক সৌন্দর্য হল তাই যখন যা কিছু ঘটছে সে ব্যাপারে নিজের ইন্দ্রিয়গুলি বন্ধ রেখে নিজেকেই নিরাসক্ত বলে ভাবেন। মূলত এই সমস্ত নেশার অনেকগুলিই এই ধরনের। আমরা আসলে শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের ছেলেমেয়েদের চিন্তা ও চেতনাকে অবশ করে ফেলছি।

আমি বিশ্বাস করি, আমরা ঠিক বিপরীত গতিপথে চলছি। দৃষ্টান্ত বা পদ্ধতির পরিবর্তন বলতে আমি এটাই বুঝি। সম্প্রতি বিভিন্ন ধরনের বিকল্প চিন্তাভাবনা নিয়ে একটা বড় ধরনের গবেষণা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে এটা ছাপা হয়েছিল। ভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনা আর সৃজনধর্মী ভাবনা এক জিনিস নয়। সৃজনধর্মিতা বলতে আমি বুঝি সত্যিকারের চিন্তাভাবনা, যার একটা মূল্য রয়েছে। ভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনা আদতে কোনও সমার্থক শব্দ নয়, কিন্তু এটা সৃজনশীলতার জন্য অপরিহার্য। এটি হল, কোনও একটি প্রশ্নের প্রচুর সম্ভাব্য উত্তর দেখতে পাওয়ার

সামর্থ। এটি হল, কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে প্রচুর সম্ভাব্য পথ। এটি হল প্রান্তিক মানুষের চিন্তাভাবনা (এড. ডি. বন্ড সম্ভবত এই কথাই বলতেন)। এটি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পথ বেয়ে চলার ভাবনা নয়, শুধুমাত্র একটি নয়, বিভিন্ন ধরনের উত্তর খোঁজা। তাই আমি মনে করি, এরজন্য পরীক্ষা রয়েছে। একটি বড় ধরনের উদাহরণ হল, একটি কাগজের ক্লিপকে কতভাবে ব্যবহারের ভাবনা চিন্তা করা যায় মানুষ এই কথাটা জিজ্ঞেস করতেই পারেন।

এগুলি সবই গতানুগতিক প্রশ্ন। অধিকাংশ মানুষই দশ বা পনেরোটি প্রশ্ন নিয়ে আসতে সমর্থ হতে পারেন। যে সমস্ত মানুষ এক্ষেত্রে ভাল, তারা দুশোটিও নিয়ে আসতে পারেন। তারা এটা বলেও করতে পারেন যে, 'আচ্ছা বেশ, কাগজের ক্লিপটি কি দুশো ফুট লম্বা হতে পারে এবং ফোম রবার ছাড়াই তৈরি হতে পারে'? জিম, আপনি জানেন, আমরা যা জানি, তাতে কি এটা একটা ছিল? এটা ছিল দীর্ঘমেয়াদী অধ্যয়ন। তাই তারা পাঁচ বছর পর আট থেকে দশ বছর বয়সের সেই সমস্ত শিশুদের পুনরায় পরীক্ষা করলেন। আপনি কী মনে করেন? পঞ্চাশ? তারা পাঁচ বছর পর তেরো থেকে পনেরো বছরের সেই সমস্ত শিশুদের আবার পরীক্ষা করলেন। আপনি এখানে একটি ধারা দেখতে পাচ্ছেন, তাই নয় কি?

এখন এটি একটি সুন্দর গল্পের অবতারণা করে। কারণ আপনি কল্পনা করছেন যে এটা অন্য পথে যাচ্ছে, তাই নয় কি? আপনার শুরুটা হয়তো খুব ভাল হয়নি, কিন্তু যতই আপনার বয়স বাড়ছে ততই আপনি ভাল করছেন। কিন্তু এতে দু'টি জিনিস দেখা যায়। প্রথমটি হল, আমাদের সকলেরই দক্ষতা রয়েছে, আর দ্বিতীয়টি হল আমাদের অতিমাত্রায় অবনতি। বর্তমানে যখন এই সমস্ত শিশুরা বড় হচ্ছে তখন অনেক জিনিসই ঘটছে। বহু জিনিস। আমি কিন্তু এব্যাপারে নিশ্চিত যে বর্তমানে তাদের

পেপার ক্লিপ-এর মতন দেখতে হবে?

বর্তমানে এজন্য অনেকগুলি পরীক্ষা করা হয় এবং সেই সম্বলিত 'ব্রেক পয়েন্ট অ্যান্ড বেয়ন্ড' নামে একটি বই দেড় হাজার লোককে দেওয়া হয়। পরীক্ষাটির আসল খসড়া চুক্তি মোতাবেক আপনি যদি একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপরে পৌঁছতে পারেন তাহলে আপনাকে ভিন্নধর্মী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সেরা হিসাবে বিবেচনা করা হবে। আচ্ছা বেশ, তাহলে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হল, ভিন্নধর্মী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সেরা হিসাবে বিবেচিত হওয়া দেড় হাজারের মধ্যে কত শতাংশকে পরীক্ষা করা হয়েছিল? এখন তাদের সম্পর্কে একটু বেশি করে জানা প্রয়োজন। তারা ছিল শিশু বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়ে। তাহলে আপনি কী ভাবছেন? সেরা স্তরে কত শতাংশ? আশি? আপনি কি মনে করেন আশি? আচ্ছা বেশ। আটানব্বই শতাংশ। বর্তমানে এই সম্পর্কিত বিষয়টি কী ব্যাপারে যে জিনিসগুলি ঘটছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তারা শিক্ষিত হচ্ছে। তারা জানে তারা দশটি বছর স্কুলে কাটিয়েছে যদি বলা হয় তখন একটিই উত্তর হল, এটা তো অতীত। তাকিও না, নকল করো না। কারণ এটা ঠকানো। আমি যেটা বলছি, স্কুলের বাইরে, তাকে বলা হয় সমন্বয়। তুমি জান কিন্তু স্কুলের ভেতরে।

বর্তমানে এটা নয়, কারণ শিক্ষকরা এটা এই পথেই চায়, যেহেতু এই মুহূর্তে এই ঘটনাটা সেই পথেই ঘটছে। কারণ এটি শিক্ষার পরম্পরার চিহ্ন। মানুষের দক্ষতা সম্পর্কে আমাদের একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা, অশিক্ষা, মূলতত্ত্ব, তত্ত্ববিষয়ক, কারিগরি প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের পুরনো ধ্যান-ধারণাকে অতিক্রম করতে হবে এবং এটা যে অবাস্তব সেটাই দেখার প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

অ্যাকাডেমিক এডুকেশন মানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন করে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকালীন যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি তাই হল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আসলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটা পূরণ করে তা ভেবে দেখার বিষয়। প্রকৃত শিক্ষা শুধুমাত্র কিছু তথ্যগত জ্ঞান নয়, প্রকৃত শিক্ষা হল মানুষের মনোজাগতিক উৎকর্ষ সাধন। আজকাল অনেকেই উপার্জনমুখী বা আয়বর্ধক শিক্ষাকে শিক্ষা বলে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকেন। শুধু উপার্জনের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা অর্জন করা হয় তাকে খণ্ডিত শিক্ষা বলা যায়। যা পরিপূর্ণ শিক্ষা নয়। শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য আসলে তা নয়। শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা অধর্মের কর্ম। শিক্ষা এমন এক শক্তি; যা মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলে। মনের আঁধার দূর করে। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করে মানুষের মানবিক গুণগুলির পরিস্ফুটন ঘটিয়ে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। জীবজগৎ ও মহাজাগতিক শক্তির মাঝে যে ঐক্যতান বয়ে চলেছে তা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ চিন্তার চেতনা তৈরি করে।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অন্ধকার বিরাজমান শিক্ষার পরশে তা দূরীভূত হয়। বিশ্বের অসংখ্য পণ্ডিত মনীষীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, অথচ তাদের দেওয়া জ্ঞানভাণ্ডার অধ্যয়ন করেই আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সার্টিফিকেট অর্জন করি। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কারোরই সার্টিফিকেট ছিল না। কিন্তু তাদের রচনা অধ্যয়ন করেই আমরা পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করি। বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে কলেজ ত্যাগ করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে। তা হলে তাঁরা কোন শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন? সেটাই হচ্ছে আসল শিক্ষা। তবে এতক্ষণ যা বলা হল তা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ শিক্ষার যাত্রা শুরু করে। এরপর যে যতদূর অগ্রসর হতে পারে। একসময় বর্তমানকালের মতো এমন বিধিবদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। সার্টিফিকেট প্রদানেরও কোনও কর্তৃপক্ষ ছিল না। তখন গুরুবাদী শিক্ষার প্রচলন ছিল। কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে গিয়ে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা শিষ্যত্ব গ্রহণ করত এবং তার সাহচর্যে থেকে শিক্ষালাভ করত। সেটাও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল। কিন্তু কোনও কাগজের সার্টিফিকেট ছিল না। তখনকার শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেই রাজার অধীনে উচ্চপদে চাকরি লাভ করতেন। কাজেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই হল শিক্ষার সোপান একথা অনস্বীকার্য। শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক দুই-ই হতে পারে। যিনি কখনও বিদ্যালয়ে যাননি তিনিও বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী। ওই বিদ্যা দ্বারা তিনি জীবিকা নির্বাহ করছেন এবং সমাজও উপকৃত হচ্ছে। তাহলে এই শিক্ষার মূল্য কি কোনও অংশে কম? মানুষ নিরন্তর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। বেঁচে থাকার এই সংগ্রামে সহায়ক যা কিছু তা সবই শিক্ষার অঙ্গীভূত। প্রকৃতপক্ষে মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করে প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতি হচ্ছে মানুষের সব চাইতে বড় শিক্ষক। রবিঠাকুর বলেছেন, ‘বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র।’ প্রাচীন বাগদাদ নগরীতে ইব্রাহিম বোগদাদী নামের এক ব্যক্তির আদব ছিল অত্যন্ত অসাধারণ। সকলেই তাকে ভালবাসত। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘হে ইব্রাহিম বোগদাদী, এত আদব তুমি কোথায় শিখলে?’ জবাবে সে বলল, ‘আমি আদব শিখেছি বেয়াদবের কাছ থেকে।’ ওই ব্যক্তি প্রশ্ন করল, এটা কী করে সম্ভব? উত্তরে ইব্রাহিম বোগদাদী বলল, বেয়াদব যা করে, আমি তা করি না।’ এভাবেই প্রকৃতির কাছ থেকে অনুপম শিক্ষা লাভ করা যায়। বিল গেটস্ বলেছেন, ‘আমি যা শিখেছি তার অনেক কিছুই অলস ব্যক্তিদের কাছ থেকে, কারণ অলস ব্যক্তিরা চিন্তা করে কীভাবে একটি কাজ স্বল্প সময়ে করা যায়। ক্লাস ওয়ান থেকে মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাকাল ১৭ বছর। এই সময়ের মধ্যে আমরা কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেওয়া পাঠ্যপুস্তকের ছকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকি। হয়তো এজন্যই রবিঠাকুর বলেছেন, ‘বিদ্যা অর্জন সহজ, শিক্ষা অর্জন কঠিন।’ প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে হলে এই ছক থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির সীমাহীন দিগন্তে পা বাড়াতে হবে। প্রকৃতির অসীম রহস্যকে জানতে হবে। প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে কীভাবে উদার হওয়া যায়। প্রকৃতি যেমন তার সমস্ত সম্পদ আমাদের ভোগবিলাস ও সুখের জন্য উদার হস্তে উজাড় করে দিয়েছে, তেমনই আমাদেরও স্বার্থের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে উদার হস্তে প্রকৃতির সেবা করতে হবে। প্রকৃতির সেবা মানেই ধর্ম। শিক্ষার এই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে হয়তো আর বলতে হবে না, ‘চারিদিকে নাগিনীরা ছাড়িতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী আজ ব্যর্থ পরিহাস।’

“আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবিকার নিশ্চয়তা দেবে আর স্বশিক্ষা সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দেবে।“

জিমরন

মূল্যবোধের শিক্ষা

শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। শিক্ষার অর্থ এই নয় যে, শুধু পাঠ্য বইয়ের মধ্যে শিশু ডুবে থাকবে। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং কৌতূহল থেকে শিশু যে শিক্ষা নিবে তা প্রকৃত শিক্ষা। এর মধ্যে মূল্যবোধ শিক্ষাটা অতীব জরুরি বিষয়। মূল্যবোধ শব্দটি সাধারণত. মূল্য ও বোধ এই দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। অর্থনীতির ভাষায় মূল্য শব্দের অর্থ কোনও কিছুর দাম, আর বোধ শব্দটি দ্বারা ব্যক্তির নৈতিকতাপূর্ণ মানসিক ভাবধারা বা আচরণকে বোঝায়। বোধ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা দেখতে পাই জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মেধাশক্তি, চেতনা, অনুভব, উপলব্ধি ইত্যাদি। সুতরাং অর্থগতভাবে মূল্যবোধ বলতে আমরা বুঝি, "মানব সমাজের কাঙ্খিত, সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিকতাপূর্ণ আচরণগুলিকেই মূল্যবোধ বলা হয়। আবার ব্যক্তির নৈতিকতাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ আচরণকেই বোঝায় যার মানবীয় সামাজিক মূল্যমান রয়েছে।" মূল্যবোধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্ উডওয়ার্থ বলেন এভাবে, 'মূল্যবোধ হল ব্যক্তির জৈব মানসিক প্রবণতার সামঞ্জস্যতাকারী আচরণের সমষ্টি।' মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ যেমন সচেতন হিসাবে বেড়ে উঠতে পারে তেমনই শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির বৈচিত্র্যতাপূর্ণ অবস্থায় সম্প্রসারিত হয়। যা সমাজের নানাক্ষেত্রে সুন্দর ও পরিপূর্ণ হতে সাহায্য করে। সমাজকে আলোকিত করার জন্য মূল্যবোধ একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মমত্ববোধ জাগ্রত হয় এবং নৈতিকতাপূর্ণ আচরণের বিকাশ ঘটায়। ব্যক্তি বিশেষের শিক্ষা, তার জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং পারস্পরিক মমত্ববোধ ও সহনশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাকে আরও বেশি সম্প্রসারিত ও আলোকিত করে। তাই বর্তমান অস্থিতিশীল পরিবেশকে সুন্দর করার জন্য মূল্যবোধ অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। শিক্ষাবিজ্ঞানীরা মূল্যবোধকে দেখেছেন এভাবে, 'মূল্যবোধ হল ব্যক্তি মানবের সামাজিক ভূষণ। সমাজ জীবনে যার বিকল্প নেই।' মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনের আচরণ ও কথাবার্তায় এক ধরনের সুন্দর মানদণ্ড আনয়নে সহায়তা করে। একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করলেও তা বৈসাদৃশ্য লাগে না। কারণ ব্যক্তির এই আচরণ মূলত. নিয়ন্ত্রিত হয় একটি জৈব মানসিক প্রবণতার দ্বারা। এজন্যই মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনের আচরণগত বৈপরীত্য দূর করতে সক্ষম। আবার ব্যক্তি তার চরম ও পরম গন্তব্যে পৌছতে একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যয় করে, কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে পৌঁছতে অপেক্ষাকৃত সাধারণধর্মী মূল্যবোধ জাগ্রত হতে পারে। আর এভাবে ব্যক্তির সাধারণ চিন্তার ধার যেমন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয় তেমনই ব্যক্তি তার বিশ্বজগতকে সুন্দরভাবে দেখার ও উপলব্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে। এভাবে একজন ব্যক্তির মধ্যে মূল্যবোধের সঞ্চারণ ঘটে এবং ব্যক্তি তার চারিত্রিক বিভিন্ন বিষয়কে সমাজে উপস্থাপন করে থাকে। শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল, মানুষকে আদর্শ জীবনের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে অধিকার নিয়ে বসবাস করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। আধুনিককালে তাই শিক্ষার চরম কোনও মতবাদকে শিক্ষাবিদ্‌রা গ্রহণ করেননি। শিক্ষার চরম লক্ষ্য আদর্শ জীবন সৃষ্টি হলেও সেই আদর্শ জীবন সম্পূর্ণভাবে বস্তুনির্ভর নয় বা আধ্যাত্মিক কোনও ব্যাপার নয়। আদর্শ জীবন লাভের জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ব্যক্তি জীবনে যখন মূল্যবোধ জাগ্রত হবে তখনই শিক্ষার চরম লক্ষ্য সাধিত হবে। তাই শিক্ষার আগেই মূল্যবোধ একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আদর্শ জীবন বলতে বুঝি, 'ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষা, জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটলে মানুষ আদর্শ জীবনের কাছে যেতে পারে।' নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধের সঞ্চালন ঘটানো প্রয়োজন। তবেই আমরা সমাজ জীবনে একজন ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজের সর্বত্র সুন্দর করার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারি। যেমন ক) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, খ) শারীরিক মূল্যবোধ, গ) সামাজিক মূল্যবোধ, ঘ) নৈতিক মূল্যবোধ, ঙ) সৌন্দর্যবোধ, চ) বৌদ্ধিক মূল্যবোধ, ছ) ধর্মীয় মূল্যবোধ। উল্লেখিত বিষয়গুলিকে একজন মানুষের মধ্যে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে সঞ্চালন করতে পারলে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি সমাজকে আলোকিত করবে। কিন্তু আমাদের পাঠ্যপুস্তক বা বিদ্যালয়গুলিতে আজ শিক্ষকরা এমন শিক্ষার ধারে কাছেও নাই। যা একটি জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্যেরও বটে। এমন আচরণ শিক্ষা বিশেষকদের ভাবিয়ে তোলে। শিক্ষাবোদ্ধারা বলেছেন, সমাজের অবক্ষয়ের কারণও আজ সমাজের সর্বত্র একই পদ্ধতির এবং একই ধরনের মানসিকতার লোক তৈরিতে সমাজের ব্যর্থ হওয়া।

আমার ছোটবেলার বন্ধু বললেন, 'আমাদের ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এমনকি আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে আজ মূল্যবোধের অভাবের কারণে চারদিকে এক হাহাকার অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং মূল্যবোধ সকল স্তরে এবং সকল শ্রেণির জন্য খুবই কাঙ্ক্ষিত।' 'আমাদের শিক্ষাক্রমে এই বিষয়টির উপর ব্যবহারিক নম্বর থাকা উচিত। কারণ শিক্ষার সার্বিক বিশ্লেষণে মূল্যবোধ একান্ত প্রয়োজন।' শিক্ষা হল সার্বজনীন আচরণের কাঙ্ক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন। আর সেক্ষেত্রে মূল্যবোধ হল ব্যক্তির সমাজ স্বীকৃত নৈতিকতাপূর্ণ মমতাময়ী আচরণ। সুতরাং শিক্ষা এবং মূল্যবোধ এই দুটি বিষয় হল আচরণগত পরিবর্তন। মূল্যবোধ শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তা হল, মানব সমাজের কাঙ্ক্ষিত এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ আয়ত্ত করা। যা সমাজ জীবনের সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে জড়িত। মূল্যবোধ

শিক্ষার্থীদের মাঝে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে সমাজ জীবনের অনেক অস্পষ্ট বিষয়কে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। সুতরাং সেই অর্থে মূল্যবোধ শিক্ষা খুবই গুরুত্বের দাবী রাখে। সমাজে সংঘাত, অহেতুক বাড়াবাড়ি, রাজনৈতিক দলাদলি, ক্ষমতার দাবি রাখা সহ আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় আজ লক্ষ্য করা যায় একমাত্র মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সেই সংঘাত এড়িয়ে চলতে পারি। বিশ্ব চরাচরে মূল্যবোধ শিক্ষার যে পদ্ধতি বা সিস্টেম তা একেবারে একমুখী, এখানে ভিন্নতার কোনও সুযোগ নাই বা থাকতেও পারে না। সেই অর্থে মূল্যবোধ শিক্ষাগ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। মানুষে মানুষে সমবেদনা প্রকাশ, সৌহার্দ্যতা, ভালবাসা এবং আচরণগত সকল দিক আলোকপাত করার ক্ষেত্রে মূল্যবোধ অতি প্রয়োজনীয় একটি উপকরণ এখানে সার্বজনীনতার একটি বিশেষ স্থান আমরা লক্ষ্য করি, যা অপরাপর বিষয়ে লক্ষ্য করা দুরহ। সেই অর্থে মূল্যবোধ অতি প্রয়োজনীয় উপকরণও বটে। বর্তমান রাষ্ট্র ও আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে যে বিক্ষুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হল মূল্যবোধের শিক্ষা নেওয়া।

আমরা অনেক সময় এই বিষয়টি উপলদ্ধি করতে সক্ষম নই বলে আজ আমাদের সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এক চরম পরিস্থিতির মোকাবিলা করছি। আর এই বিশেষ কারণগুলিকে সামনে নিয়ে হয়তো আমার দুই বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী আমাকে মূল্যবোধ সর্ম্পকে লেখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাদের সেই ধন্যবাদের আরেকটি বিশেষ দিক আমি লক্ষ্য করি তা হল, উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের পরও আমাদের মাঝে একে অপরের প্রতি সম-আলোচনা ও সমমর্যাদা দিতে ব্যর্থ অনেকাংশে সমবেদনা দিতেও অপারগতা দেখানোর, জানানোর মতন ঘটনা ঘটে। আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সকল স্তরে মূল্যবোধের এই আকাল আমাদের মধ্যে এক চরম অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে। তাই এই বিষয়টিও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মূল্যবোধ একজন ব্যক্তি নয় সমাজ বদলেরও হাতিয়ার। আমার এই লেখার মাধ্যমে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য সমাজে নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। কারণ তাদের কাজের কারণে এখনও আমরা সঠিকভাবে চলার সুযোগ পাচ্ছি। বিশ্বকে দুষণমুক্ত, কুলুষমুক্ত, মানবতার প্রতি রূঢ় আচরণ মুক্ত, শান্তি ও স্থিতিশীলতার মধ্যে আনতে হলে সবার এখন প্রয়োজন মানবীয় আচরণ তথা মূল্যবোধের শিক্ষা নেওয়া।

আমরা আমাদের আচরণ, কথাবার্তা এবং চালচলনে এই বিষয়টির প্রতি অধিক হারে মনসংযোগ ঘটাতে অক্ষম বলে আজ আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের এক চরম অধ্যায়কে আমরা মোকাবিলা করছি। এই অবস্থার পরিত্রাণ দরকার। কেননা সমাজকে, রাষ্ট্রকে সুন্দর করার প্রথম হাতিয়ার হল শিক্ষা, আর এইক্ষেত্রে আজ চরম শূন্যতা আমরা লক্ষ্য করছি মূল্যবোধের। তাই রাষ্ট্রীয় সকল দিক বিশ্লেষণ করতে আমাদের মূল্যবোধ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় খুব নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। তাই আজকের শিক্ষার একমাত্র কালজয়ী স্লোগান হওয়া উচিত 'মূল্যবোধ শিক্ষা'। শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধের একটি সুন্দর সর্ম্পক বিরাজ করছে। যে শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধের সর্ম্পক নেই তাকে কখনও সঠিক শিক্ষা বলা যায় না। যে কোনও ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রেও মূল্যবোধ একটি সুন্দর আচরণ যা অপরাপর শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় নয়। তাই সবার আগের প্রয়োজন মূল্যবোধগত শিক্ষার ধারণা জন্মানো। একটি জাতি কতটা সভ্য তা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও মূল্যবোধ একটি প্রধান মাপকাঠি হবে এটাই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু আমাদের জাতীয় কৃষ্টি-সভ্যতা আজ চরমভাবে এই একটি বিষয়কে এড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা কোনোক্রমে এই বিষয়কে আমাদের সামনে হাজির করতে পারছি না যে, কীভাবে এটি সম্ভব। মূল্যবোধ সমাজ জীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ হিসাবে যেমন দাঁড়িয়ে আছে তেমনই তা থেকে বের হওয়ার কোনও উপায় আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখছি না। তাই মূল্যবোধ আছে তো আমাদের জীবনে সবই আছে, আর এর ঘাটতিতো আমাদের সকল স্তরের ঘাটতিও বটে।

শিক্ষাবিদ্‌দের মতে, পরিপূর্ণ শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তির মাঝে পরিপূর্ণ মূল্যবোধের বিকাশ ঘটতে পারে না। এক্ষেত্রেও সুশিক্ষার এবং সুমানুষের প্রয়োজন রয়েছে। যথার্থ মূল্যবোধে জাগ্রত একজন মানুষ যেমন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে নিয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম, তেমনই একজন সুনাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি গুরুত্বের দাবী রাখে। তাই ব্যক্তি জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে এই জাতীয় শিক্ষা মানুষকে, সমাজকে উন্নত করতেও সক্ষম হয়। তাই রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের জন্য প্রয়োজন সঠিক মূল্যবোধ শিক্ষা। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মূল্যবোধ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে পারে এভাবে, ১। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সকল স্তরে মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া, ২। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ জাগরণে কাজ করে, ৩। সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও আদর্শ লালনে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়, ৪। বস্তুগত ও সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে, ৫। পরিবেশ, প্রতিবেশ সর্ম্পকে মূল্যবোধ জাগরণে কাজ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সমাজ পরিবর্তনের আধুনিক ও নান্দনিক সংস্করণ হিসাবে সমাজ বিবেচনা করে। সুতরাং এক্ষেত্রে একটি যথার্থ ভূমিকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করতে পারে। জাতিগত ঐক্য, সহনশীলতা এবং মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য আনয়নে মূল্যবোধ একটি সুন্দর ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই সময়ের প্রয়োজনে এবং সময়কে কালজয়ী করে একথা বলা যায় যে, শিক্ষা এবং মূল্যবোধ জাগরণের একটি বৃহৎ সূচিকাগার হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে সমাজকে সুন্দর করার কোনও উপায় নেই। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হোক মূল্যবোধ শিক্ষা। তবেই আমরা আমাদের সমাজকে আলোকিত করতে সক্ষম হব, এর ব্যতিক্রমের জন্য আমাদের রয়েছে চরম হতাশা।

প্রকৃত শিক্ষা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ' আনন্দহীন শিক্ষা, শিক্ষা নহে। যে শিক্ষায় আনন্দ নাই, সেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না।' পূর্বে শিক্ষা বলতে বোঝানো হত, শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা বা শাসন করা। শিশুকে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি করে বিদ্যাদান করার যে পদ্ধতি তাকেই আমরা শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করি। কিন্তু এই বিদ্যা চাপিয়ে দেওয়া কিংবা পরীক্ষায় ভাল ফলাফল লাভ করার নাম, এটা শিক্ষা হতে পারে না। এই পদ্ধতি একজন মানুষের জন্য সংকীর্ণ শিক্ষা। একজন মানব শিশুর গ্রহণ উপযোগী আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষাদানই হল প্রকৃত শিক্ষা।

শিশুরা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আজ যে শিশু আগামীতে সে বড় হলে সমাজ তথা দেশ কিংবা গোটা বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করবে। তাই শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। শিশুমন হল পাখির মতো মুক্ত। তার চোখে থাকে সাগরের বিশালতা। সে বাস করতে চায় অবাধ আকাশে। তাই সুশিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা আমাদের নৈতিক এবং একান্ত দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা। কিন্তু আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এমনই যে, এটি এখন হয়ে উঠেছে কেবল অর্থলাভের উপায়। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আমাদেরকে এমনটি করার প্রলোভন দিচ্ছে। অথচ মানুষের ভেতরে যে 'মানুষ' বাস করে সেই ভেতরের মানুষটিকে বের করে আনতে পারে কেবল সুশিক্ষা এবং স্বশিক্ষা। আমরা মনে করি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পড়াশোনার সুযোগ যে মানুষ পায় না, সে শিক্ষিত নয়। এই ধারণা থেকে আমরা জগতে সকল পুঁথিগতহীন সৃজনশীল মানুষগুলিকে অশিক্ষিতের কাতারে সামিল করি এবং তাদের সাথে এমন আচরণ করি কেবল আমরাই পুঁথিগত বিদ্যাধর শিক্ষিত। অথচ আমাদের বুঝতে হবে আসলে প্রকৃত শিক্ষিত কারা এবং আমাদের শিক্ষার্থীদেরও ছোটবেলা থেকে এই শিক্ষা দিতে হবে যে, পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনকারী কেবল শিক্ষিত নন।

শিক্ষা সভ্যতার বিকাশ ঘটায়, শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার জীবন থেকে আলোয় নিয়ে আসে। সমাজে ঘাড় উঁচু করে, মেরুদণ্ড সোজা করে সবাই বাঁচতে চায়। মেরুদণ্ডহীনভাবে বাঁচার মধ্যে কোনও মর্যাদা নেই। আমরা অনেকেই নিজেকে শিক্ষিত বলে গর্ব করি। কিন্তু শিক্ষার আসল রূপ কী হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে অবগত নই। আমরা জানি শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। আর এই জীবনব্যাপী শিক্ষার বাস্তবায়নে চাই স্বশিক্ষা। লেখক প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বই পড়া' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।' এই উক্তিতেই আমরা বুঝতে পারি কোনও মানুষকে শেখানো যায় না, যদি সে নিজে না শেখে। যে স্বশিক্ষিত সে নিজের অভিমত বিদ্যা নিজেই অর্জন করতে পারবে। যে মানুষ নিজের হৃদয় বৃত্তির প্রকাশ ঘটাতে পারে সেই স্বশিক্ষিত। আত্মিক উন্নয়নমূলক শিক্ষা নিজেকেই অর্জন করতে হয়। শিক্ষাগ্রহণ শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত, বাবা-মায়ের ইচ্ছার উপর নয়।

কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বশিক্ষণ লাভ করার

কোনও উপায় নাই। কেননা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হল বিদ্যা চাপিয়ে দেওয়ার, শিখন প্রক্রিয়ার নয়। প্রতিটি স্বাভাবিক শিশুই সৃজনশীল। সৃজনশীলতা হল নিজের মতো করে কিছু করা, সবার চেয়ে আলাদা কিছু করা। প্রতিটি শিশুর মধ্যে এই সৃজনশীলতা সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। পুঁথিগত শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জ্ঞানলাভের মাধ্যমে এই সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান সৃজনশীলতাকে বাস্তবায়ন করতে পারাই প্রকৃত শিক্ষা অর্জন। প্রতিটি শিশু নিষ্পাপ, ফুলের মতো। সব শিশুর রুচি এবং চাহিদা একরকম নয়। শিশুর রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী তার মনের ভীতি দূর করে তাকে সৃজনশীল কাজে সহায়তা করা শিশুর বাবা-মা এবং প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য। শিশুর মাঝে মুক্ত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হয়। যেমন কোনও শিশু হয়তো বইয়ের পড়া ভাল শিখতে বা লিখতে পারে না। কিন্তু সে সুন্দর করে কবিতা আবৃতি করতে পারে। আবার কোনও শিশু গল্প লিখতে পারে। আবার অনেকে ভাল অভিনয় করতে পারে। কেউ কেউ ভাল ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা পরিবার শিশুদের এইসব প্রতিভা বিকাশে নিরুৎসাহিত করে। তাদের উপর পরীক্ষায় ভাল করার চেষ্টা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এইসব শিশুর সহজাত প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। যদি তাদের প্রতিভাগুলি শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা নিয়ে আসতে পারি তাহলে এক একজন শিশু প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সৃজনশীল ও মানবিক মানুষে পরিণত হবে।

চার দেওয়ালের ভেতর শিশু যে শিক্ষা গ্রহণ করে স্বশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সে নিজে নিজে তার চেয়ে হাজার গুণ ভাল শিক্ষা শিখে নিতে পারবে। একজন শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আর্থিক উন্নয়নের জন্য পড়বে এবং প্রাপ্তিযোগ হলে পড়া ছেড়ে দিবে — এই পদ্ধতি চিরস্থায়ী কিছু নয়, এটি মানুষকে লক্ষ্যহীন ও মূল্যবোধহীন করে দেয়। যে শিক্ষা আলো ছড়ায় না, সে শিক্ষা আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হতে শেখায় না — জীবনের চলার পথকে মসৃণ করে না। আনন্দময় ও শিশুবান্ধব শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ। শিখন-শেখানো কার্যাবলী অবশ্যই হতে হবে শিশুকেন্দ্রিক। বিদ্যালয়ে থাকতে হবে খেলার মাঠ ও পর্যাপ্ত খেলাধূলার সামগ্রী। শিশুর জন্য খেলাধূলার মাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাভাবিকভাবে খেলাধূলা করতে না পারলে তাদের মনোজগতের বিকাশ ঘটে না।

বিদ্যালয়ে থাকতে হবে শিশুর চাহিদা মতো শিক্ষা-উপকরণ, শিশুতোষ সাহিত্য ও লাইব্রেরি। বিদ্যালয় আঙ্গিনা হবে নান্দনিক, মনোরম ও শিশুর উপযোগী। চারু-কারু, সংগীতের মতো সৃজনশীল কাজেও তাদের উৎসাহিত করতে হবে। স্কুল যেন হয় শিশুর স্বপ্নের ঠিকানা — ওড়ার আকাশ, যেখানে শিশু অনায়াসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিচরণ করতে পারবে জ্ঞানের রাজ্যে। তার ভেতরে যে “আমিত্ব” বাস করে তাকে নির্মূল করতে হবে। তাকে সহমর্মী হতে শেখাতে হবে। তার চিন্তন দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে হবে। তাকে আত্মসচেতন একজন মানুষরূপে গড়ে তুলতে হবে। সামান্য ভুলের জন্য তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া যাবে না। শিশুকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে এবং তার প্রতিভা বিকাশে সামাজিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুস্থ-সুন্দর সামাজিক পরিবেশ শিশুর মেধা ও মননশীলতা বিকাশে অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। পরিবার এবং সমাজকে হতে হবে শিশুবান্ধব ও শিশুশিক্ষার উপযোগী। শিশুর চিত্তবিনোদনের জন্য খেলার মাঠ, ক্লাব, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে তাদের স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে এবং সুন্দর সমাজ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার প্রেরণা দিতে হবে।

মানুষের জ্ঞান ও চিত্তের উৎকর্ষের জন্য, মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য, চরিত্র গঠন ও মানবীয় মূল্যবোধের জন্য এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা হচ্ছে প্রধান নিয়ামক। নেতিবাচক শিক্ষা বা আর্থিক উন্নতি লাভের জন্য শিক্ষা কখনও প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। শুধু বড় বড় ডিগ্রি পেলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না। শিক্ষার সঙ্গে থাকতে হবে সংস্কৃতি, রুচিবোধ, মানবতাবোধ। তবেই শিক্ষা হয়ে উঠবে প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষার আলো সমাজ ও দেশের মঙ্গল ঘটায়। মানুষের মঙ্গল করে। মানুষের কল্যাণসাধন করে। দুর্লভ হীরার চেয়েও মূল্যবান সুশিক্ষা।

শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় যে শিশুকাল তা বলার অবকাশ রাখে না। শিশুরা তাদের চারপাশ থেকে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করে। তারা শেখে তাদের পরিবার, সমাজ, শিক্ষাঙ্গন ও পরিবেশ থেকে। মানুষের মনের মণিকোঠায় তারাই চিরস্মরণীয় থাকে যারা নিজেদের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত। আর তারা এই জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছেন প্রধান উপকরণ সুশিক্ষার দ্বারা। তাদের কাছে শিক্ষা বাইরের ব্যাপার নয়, অন্তরের ব্যাপার। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ উপলব্ধি করতে পারে জীবন-মূল্য।

“বিশ্বকে বদলে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী যে অস্ত্রটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন তা হচ্ছে শিক্ষা।“

নেলসন ম্যান্ডেলা

শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি পর্যবেক্ষণেই কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজন

আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ আমল থেকে আরম্ভ করে আজ অবধি চলে আসছে। এই ব্যবস্থা আসলে বলা চলে পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক। কোনও রকমে পাঠ্য বইয়ের কথাগুলিকে মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় উদ্গীরণ করতে পারলেই যেন, কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অসুবিধাটি তাদের আসে না। সুতরাং এমন পরীক্ষা জ্ঞানের পরীক্ষা না হলেও 'স্মৃতি-শক্তির' পরীক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। তাদের সুন্দর জীবন গঠনে পুঁথিগত বিদ্যার কিছুটা প্রয়োজন আছেও বৈকি, এই কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু, 'পুঁথিগত' শিক্ষা মানুষের জীবনের সমস্যা সমাধান করে না। জার্মানির বোখুম শহরের একটি স্কুলে পড়াশোনা বিষয়টি একবারেই নতুন পদ্ধতিতে হয়, শেখানো হয় খেলাধূলার ছলে। সেখানে প্রোমোশন ও ভাল রেজাল্ট বড় কথা নয়।

ছোট ছেলেমেয়েরা কারিগরি ক্লাসে তরোয়াল তৈরি করতেই শেখে। আসলে তারা খেলার ছলেই শেখে বিভিন্ন কায়দাকানুন। তাছাড়াও প্রতিটি শিশুর কাজ করার ধরনও আলাদা। সুতরাং শিশুরাই যেন প্রস্তাব দেয়, তারা কী করতে চায় বা না চায়। শিশুর ইচ্ছেটার প্রতি এখানে পুরোপুরি দাম দেওয়া হয়। শিক্ষালাভের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ নয়-বলা যায় 'বিস্তৃত'। বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ছাড়াও যে সমস্ত কাজগুলি বিদ্যালয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেগুলিকে আপাত-দৃষ্টিতে অর্থহীন বলে মনে হলেও যেন প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যেমন বাগান করা, পিকনিক করা, নানাবিধ উৎসব পালনের শিক্ষা, গণতান্ত্রিক জীবনযাপনে শিক্ষা, ছড়া-আবৃত্তি এবং গল্পে শিক্ষা, কর্মসঙ্গীত, সাফাই কিংবা প্রার্থনায় শিক্ষা, চলতি খবর, সমবায় সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা, পরিবেশ পর্যবক্ষেণে শিক্ষা, দিনলিপির দ্বারা শিক্ষা, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত এবং খেলাধূলাসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে, সেগুলির দ্বারা তাদের শিক্ষার উন্নতি প্রসারিত হবে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের দেশের শিশু-কিশোররা বড্ড বেশিই একমুখী হয়ে যাচ্ছে। উপযুক্ত 'কর্মমুখী' শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে শিশু-কিশোররা যেন মনুষ্যত্ব অর্জনে যথার্থ ''মানুষ'' হতে পারে। সুতরাং সন্তানের শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে শিক্ষাগ্রহণের নানা ধরনের 'প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো' বর্তমান রয়েছে। সকল শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে 'জ্ঞানদান' করা। কিন্তু, "কারিগরি" জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই যেন শিশু-কিশোররা দিনে দিনে যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছে। সে উদ্দেশ্যে আজও তেমন 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' গড়ে উঠেনি। শিশু-কিশোরদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে যদি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করি, তবেই এই প্রচলিত শিক্ষাকে কখনই পরিপূর্ণ শিক্ষার আখ্যা দেওয়া যায় না। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের অতি স্বাভাবিক মানসিক পরিণতি এবং কৌতূহল, আগ্রহ, আবেগ, আনন্দ, সামর্থ্য কিংবা অনুরাগের মতো এই স্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে একেবারেই অস্বীকার করা হয়েছে।

শিশুদের সুস্থ-সবল দেহ ও মন, সাহস, ধৈর্য, কর্তব্যবোধ বা দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা, সত্য, সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া, কর্মক্ষমতা বাড়ানো, স্বার্থত্যাগ, সহযোগিতা, রুচিবোধ, স্বদেশ প্রেম এবং নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা ছাড়াও বহু কিছুই আছে, যা এমন প্রচলিত পুঁথিগত শিক্ষাব্যবস্থায় দেওয়া হয় না। শিশু কেবল তার কান দুটির মাধ্যমে শুনে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান লাভ করে। তাই শিক্ষায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শিশু স্বভাবতই কর্মী, কিন্তু শ্রোতা হতে কষ্টবোধ করে। ধৈর্য তাদের অনেকাংশে কম। কর্মচঞ্চলতাই তাদের স্বাভাবিক ধর্ম। শিশুদের এমন প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্মকে অস্বীকার না করে, নানা রকম শিল্প এবং হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ দরকার। শিশুর প্রয়োজনের দিকগুলিকে দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে নিরানন্দ মনটিকে আনন্দিত করা বাঞ্ছনীয়। তারা লিখতে, পড়তে, অঙ্ক কষতেই শিখেছে, কিন্তু শেখেনি কাজের মানুষ হতে, সামাজিক হতে, স্বাবলম্বী বা আত্মপ্রত্যয়শীল হয়ে ওঠাও তাদের কখনই হয়নি। এককথায় বলাই যায়, প্রচলিত শিক্ষা শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারেনি। শিক্ষার মুল কথা হল, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, তাদের দৈহিক বৃদ্ধি, মানসিক এবং আত্মার উন্নতিসাধন করা, আবেগ-অনুভূতির যোগ্য প্রকাশের সুযোগ করানো।

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে শিশু-কিশোররা যোগ্যতা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে কেমন করে সেটিই আসলে ভাবনার বিষয়। শিক্ষাতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরিবর্তন না হলে তা কখনও সম্ভব নয়। শিশুরা যখন সারা বিশ্বে উন্নতি এবং অগ্রগতির অবদানের পাশাপাশি খেলাধূলা সহ সৃষ্টিশীলতায় পারদর্শিতা অর্জনের সঙ্গেই সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছে, তখন এদেশে শিশু-কিশোররা ক্রমশই যেন পিছিয়ে পড়ছে। সুতরাং শিশুদের এগিয়ে যাওয়ার বিনোদন ক্ষেত্র সৃষ্টি করতেই হবে। শিশুদের বিনোদনের জন্য একেবারে শৈশব থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খেলার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই খেলাগুলি যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষে আবদ্ধ শিশুদের কচি মুখের দিকে দৃষ্টি দিলে মনে কষ্ট জাগে। বদ্ধ কক্ষে বসে শিক্ষকদের 'বক্তৃতা' শুনতে তারা নারাজ। একটু নড়াচড়াতেই যেন শিক্ষকের ধমকানি। তাদের দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে বিচার করলে এই শিক্ষা পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। শিশুকে অবাধ খেলাধূলার স্বাধীনতা কখনই দেওয়া হয় না।

আসলে ক্লাস শুরুর আগে খেলাধূলা করলে সব শিশুরা শান্ত মনে এবং স্থির চিত্তে বিদ্যাপাঠে বা শিক্ষাগ্রহণে মনোযোগী হতে পারে। বিভিন্ন কারণে তাদের অনেকেই মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ এবং ভয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে। মনের মধ্যে ওই সকল প্রবৃত্তি, ভাবাবেগ, শান্ত মন, অস্থির চিত্ত দূর হবে।

সুস্থ কিংবা সবল জাতি গঠনে খেলাধূলার কোনও বিকল্প নেই। পাঠ্যাভ্যাসে একঘেয়েমির জন্যে শিশুরা স্কুলমুখী হতে চায় না। আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যমেই পাঠদান করানো দরকার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''বাল্যকাল হইতেই আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নেই, কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তা কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। সঠিক শিক্ষা না হলেই যে পারিবারিক, সামাজিক দ্বায়িত্ব পালনে তারা তেমন কোনও সহায়তাই করে না।

সুতরাং জীবনের বৃহত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে যে গুণাবলীর প্রয়োজন, সেইগুলি পুঁথিগত শিক্ষা থেকে আহরণ করা যায় না। জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়েই যে শক্তি অর্জিত হয়, সে শক্তি অর্জনটাই যেন শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিশুদের জন্মগ্রহণ করালেই সে শিশু প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। শিশু সন্তানকে যথার্থ মানুষের মতো মানুষ করে তোলার জন্যে সাধনার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হয়। কোমলমতি শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। শৈশবের সময়টাই প্রাণোচ্ছলতা কিংবা আরামের মুহূর্ত। সেই দিকটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে লালন-পালন করতে হবে। সন্তানরা তো কখনও-সখনও 'ক্লান্ত-শ্রান্ত' হয়ে ঘুমে ঢুলুঢুলু বা অস্থির কিংবা চঞ্চল হয়। ঠিক তখন শিশুকে পাঠ্যাভ্যাসে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কারণটা হল, তখন এসব শিক্ষা মনে বসবে না। এমনকি সে এসম্পর্কে পাল্টা প্রতিক্রিয়াও দেখাতে পারে। তাই শিশুদের গল্প শোনাতে হবে। শিশুদের বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের গল্প, গাছপালা নিয়ে গল্প, রূপকথার গল্প, সহজ পৌরাণিক গল্প, মজার গল্প, পরীর গল্প এবং জন্তু-জানোয়ারের গল্পগুলি ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করা প্রয়োজন। কাল্পনিক গল্প শিশুরা অনেক ভালবাসে, কারণ তারা কল্পনাপ্রবণ। সৃজনশীলতা বাড়াতেই পাঠ্য পুস্তকের পড়াশোনার পাশাপাশি কল্পনা ও কর্মমুখী বিষয়গুলিতেই জোর তাগিদ দেওয়া আবশ্যক।

পড়াশোনাকে প্রাণবন্ত এবং উপভোগ্য করবার জন্য মাঝেমধ্যে তাদেরকে নিয়ে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজন রয়েছে বৈকি। মানসিক গঠনের জন্যে যে "মূল-মন্ত্র" আছে, তাকে পরিপূর্ণতা দিতে শিশু, কিশোর কিংবা শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষামূলক মজার মজার সহজ পুস্তক তুলে দেওয়া দরকার। প্রযুক্তিগত ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি তাদেরকে এনে দিতেই পারে সৃজনশীলতা, মননশীলসম্পন্ন অনেক আবেগ। পাঠ চর্চার কঠোরতার কারণে শিশুদের মানবিকতা, মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য প্রীতি যেন বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সন্তানরা দিনে দিনেই মাদকতা, সন্ত্রাস, নেশা, দুর্নীতি সহ খুন নিয়েই কোনও না কোনোভাবে বড় হবে। এই সকল সংঘটিত হচ্ছে উঠতি বয়সী কোমলমতি সন্তানদের মাধ্যমেই। ফলে যোগ্য হিসেবে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতেও পারছে না।

চিন্তাবিদ্‌রা বলছেন, এমন নানা ভাবনা থেকে পরিত্রাণের উৎকৃষ্ট উপায় হল বিনোদনমূলক বই পড়ানোর অভ্যাস তৈরি করা। বই পাঠে তাদের আনন্দ আসবে, মানসিক পরিবর্তন ঘটবে এবং সন্তানের উন্নত ধ্যান-ধারণাও জন্মাবে। ফলত তারা আপন জগতকেও চিনবে। অপরাধবোধ, অপচিন্তা দূর হবে। দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, আপনাতেই জেগে উঠবে। আর তখনই উন্নত, সমৃদ্ধতর 'জাতি' তৈরির স্বপ্ন পূরণ হবে। শেষ নিরিখে বলা যায়, শিশুর শিক্ষার প্রধান কথা আগ্রহ সৃষ্টি। তাই ভাল লাগা, মন্দ লাগা এবং রুচিশীলতা বৃদ্ধি করার সঙ্গে বুদ্ধির প্রবণতাকেই কর্মমুখী শিক্ষায় জীবন গড়া প্রয়োজন।

গ্রামীণ শিক্ষায় 'নবদিশা'

নবদিশা মনে করে, গ্রাম হচ্ছে শিক্ষার আদর্শ গবেষণাগার। বিশেষ করে সেই শিক্ষা যখন হয়, পরিবেশ নির্ভর হাতে-কলমে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা। যেখানে শিখে ছাত্রছাত্রীরা নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে এবং তা নিয়ে নিজেরা নিরন্তর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত থাকবে। গ্রামের প্রবীণ মানুষেরাই হচ্ছেন গ্রামের অতীত সময়ের সাক্ষী, স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাদের কাছ থেকেও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে। শিক্ষা হয়ে উঠুক আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক, যে শিক্ষা গুরুত্ব দেবে মানুষের মৌলিক চাহিদাকে। এই স্বপ্ন বুকে নিয়েই পথ চলছে নবদিশা।

আসলে সমাজকে গড়তে হলে আগে সেই সমাজের মানুষ গড়ার আয়োজন করতে হবে। আর সেই মানুষ গড়ার আয়োজনই হল আসল শিক্ষা। কোনও কিছু শেখাই শুধুমাত্র শিক্ষা নয়, সমগ্র জীবন ও জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন করার নামই শিক্ষা বলে বিশ্বাস করে নবদিশা।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে এসডিজি অর্জনের পূর্বশর্ত

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি এর গুণগত মান নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্ব বহন করে। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং স্থানীয় পরিমন্ডলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠদান কর্মসূচি, উপযোগী স্থান ও সিলেবাস বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট চার-এ গুণগত মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণেও বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও, এর মান নিয়ে সংশয় রয়েই গেছে। বিশেষ করে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত এবং রক্ষা করা, এই দুই-ই কঠিন হয়ে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা ও অভিভাবকদের উদাসীনতা এই বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলছে। টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে সারাদেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে শিশুদের বিদ্যালয়মুখী ও তাদের মধ্যে আনন্দদায়ক এবং গ্রামীণ প্রাসঙ্গিক কর্মভিত্তিক শিক্ষার অভ্যাস যদি গড়ে তোলা যায় তাহলে ঝরে পড়ার হার কমে আসবে, সর্বোপরি লেখাপড়ায় তাদের আরও উৎসাহী করে তুলবে। সরকারি উদ্যোগের একটা প্রয়োজন রয়েছে, পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলি আফটার স্কুলের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। আমরা যা গ্রহণ করছি তাহলে আফটার স্কুল কী? আফটার স্কুল হচ্ছে স্কুল ছুটির পর সেই স্কুলের কোনও একটি শ্রেণিকক্ষে গ্রামের যুবক-যুবতীদের নিয়ে স্থানীয় উপযোগী দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা এবং তাদের মধ্যে যাতে আত্মিক এবং মানবিক বিকাশ গড়ে তোলা যায়, আমরা তাতেই জোর দিতে চাই। কারণ মানবিক মূল্যবোধের অভাব দেখা দিচ্ছে। মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলি ভেঙে যাচ্ছে। এগুলিও শিক্ষার মধ্যে আনতে হবে, কারণ এটাও শিক্ষার অঙ্গ। শুধু পড়াশোনা করলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না, মানবিক মানুষ হতে হয়। গ্রামে থেকেই স্কুলের শিশুরাও নাচ, গান, নাটক, ছবি আঁকা এবং হাতের কাজ শিখতে পারে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে। এরজন্য যা লাগবে তা হল, অভিজ্ঞ রিসোর্স পার্সন। এধরনের পাঠদান কেন্দ্রে প্রশিক্ষিত ও মেধাবী রিসোর্স পার্সন নিয়োগ নিশ্চিত করা গেলে গ্রাম পর্যায়েও ব্যাপক হারে নানা ধরনের মেধার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে। পরবর্তীতে এসব শিক্ষার্থীরা গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারবে।

বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

জুলিয়াস কামবারাগে ন্যেরেরে

(১৯২২-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ)

ইউসুফ কাসসাম- এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

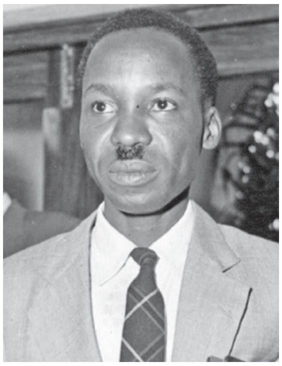

একটি সেমিনার চলছে। আলোচনার বিষয়- 'শিক্ষা আর উন্নয়ন'। চলছে মত প্রকাশ, আদান-প্রদান, আলোচনা। সেমিনারের ঘরটা যদি বড় হতে হতে গোটা একটা দেশ হয়ে যায়। আর সঞ্চালক-অধ্যক্ষের চেয়ারে যদি বসেন সে দেশের রাষ্ট্রপতি!

১৯৫৭ সাল। তানজানিয়া প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস ন্যেরেরে। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশটা সরগরম-ঔপেনিবেশিক ধারায় বাঁচা বস্তা-পচা সমাজটাকে পাল্টাতে হবে। রাষ্ট্রপতি তাঁর দেশের উন্নয়নের লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ করছেন। ঘোষিত হচ্ছে " আরুশা ডিক্ল্যারেশন"। এদেশে উন্নয়নের ভিত্তি হবে সমাজবাদ আর স্বনির্ভরতা। কোন পথে উন্নয়ন হবে ভাবতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি তাঁর শিক্ষা-দর্শন প্রকাশ করছেন। উন্নয়নের লক্ষ্য মুক্তি। শিক্ষার লক্ষ্যও মুক্তি। রাষ্ট্রপতির অন্তরে লুকিয়ে থাকে এক শিক্ষক। জুলিয়াস ন্যেরেরে-র পথ চলা শুরু হয় ক্লাসঘর থেকেই।

তাই রাষ্ট্রনেতার ভূমিকা পালনের পেছনে শিক্ষার দুনিয়া থেকে শিখে নেওয়া এক প্রত্যয়। যার বৈশিষ্ট্য অবিরাম মূল্যায়ন, অবিরাম শিখন আর ব্যাখ্যা। দেশ গঠন হয়ে দাঁড়াল বৃহৎ অর্থের শিক্ষাচর্চা।

তানজানিয়ার সামনে তখন অনেকগুলি লড়াই -

১) দারিদ্র্য

২) সামাজিক-অর্থনৈতিক অসাম্য

৩) জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুন্নয়ন

৪) আর সবচেয়ে পীড়াদায়ক ঔপেনিবেশিক শাসনে নিমজ্জিত এক জাতি। নৈরাশ্য আর অদৃষ্টের দোরগোড়ায় মাথা খুঁড়ছে।

ন্যেরেরে দেশের হাল ধরলেন। তানজানিয়া হয়ে উঠবে স্বনির্ভর। উন্নয়নের উড়ান চাই। কিন্তু পাশ্চাত্য কায়দার উন্নয়ন নয়। ধন, অর্থের হাত ধরে উন্নয়ন আসবে না। আসবে মানুষের হাত ধরে। সমাজবাদী উন্নয়ন, মানুষ কেন্দ্রিক উন্নয়ন। উন্নয়নের ফলে থাকবে সবার সমান অধিকার। ন্যেরেরে-এর মতে, এই উন্নয়নকে পূরণ করতে হবে তিনটি পূর্বশর্ত দিয়ে। জমির সদ্ব্যবহার, সু-নীতি, সু-নেতৃত্ব। কৃষি প্রধান দেশ তানজানিয়া। উন্নয়নের বাস্তব রূপায়ণ হতে হবে গ্রামে। গ্রামের মানুষ এক সঙ্গে বাস করবে, কাজ করবে। সমবায় ভিত্তিতে তৈরি হবে সংগঠিত গ্রাম বা "উজামা" (বাংলায় "পরিবারত্ব)। পরিবারত্ব হবে তানজানিয়ান সমাজবাদের ভিত্তি। এই সমাজবাদী, স্বনির্ভর উন্নয়নে সক্রিয় অংশ নেবে সাধারণ মানুষ। উন্নয়ন নীতি পরিকল্পনায় অংশ নেবে মানুষ। তারাই সিদ্ধান্ত নেবে কোন পথ ভাল বা মন্দ। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তারা যোগদান করবে। প্রত্যেকের জীবনমান উন্নিত হবে। দেশে রাজনৈতিক-সামাজিক সমতা প্রসারিত হবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য বিলাসবহুল জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা উন্নয়নের লক্ষ্য হবে না। সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ করতে করতে ন্যেরেরে এক বিকল্প শিক্ষা মডেল পেশ করলেন। ঔপেনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার খোল-নলচে বদলাতে হবে। দেশ গঠন চলবে দুই ডানায় ভর করে-

১) স্বনির্ভরতার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা

২) বয়স্ক শিক্ষাক্রম, যার লক্ষ্য হল জীবনভর শেখা, জানা আর যুক্তিকামিতা।

ন্যেরেরে -র বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা হবে সমতা, স্বনির্ভরতার দূত। ঔপেনিবেশিক কৌলিন্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থাকে বদলাতে হবে। তেমনটি চাইলেন ন্যেরেরে। বিশেষ কয়েকটি পেশায় মানুষ যোগান দেওয়ার কাজ শিক্ষার নয়। শিক্ষিত হয়ে ওঠার অর্থ সমাজ বিচ্ছিন্নতা নয়।

এই সমাজবাদী, স্বনির্ভর উন্নয়নে সক্রিয় অংশ নেবে সাধারণ মানুষ। উন্নয়ন নীতি পরিকল্পনায় অংশ নেবে মানুষ। তারাই সিদ্ধান্ত নেবে কোন পথ ভাল বা মন্দ। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তারা যোগদান করবে।

ন্যেরেরে-র প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অবশ্যই কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হবে –

১) কৃষি প্রধান তানজানিয়ায় শিক্ষাকে হতে হবে গ্রামমুখী।

২) শিক্ষক/শিক্ষিকা-পড়ুয়ারা স্কুলের মধ্যেই উৎপাদনশীল কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। আর এই ধরনের কর্মসূচি পরিকল্পনা করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পড়ুয়ারাও অংশ নেবে।

৩) স্কুল পাঠক্রমে এই উৎপাদনমুখী কর্মসূচি অর্ন্তভুক্ত থাকবে। তত্ত্ব আর চর্চার মেলবন্ধন ঘটবে। শেখা-জানা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

৪) চলতি প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষা পদ্ধতি গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। পরীক্ষায় পাস করার মূল্য থাকবে না। পড়ুয়ার পড়াশোনার মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব পাবে সে সমাজ-

গোষ্ঠীতে কতটা অবদান রাখছে।

৫) শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হবে ৭ বছর বয়সে। সে যখন প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পেরোবে, ততদিনে সে একজন স্বনির্ভর, উৎপাদনশীল সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠেছে।

৬) শিক্ষার প্রতিটি স্তর যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা– নিজ নিজ ক্ষেত্রে হবে স্বয়ংসম্পূর্। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা কেবলমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষালাভের উপায় হয়ে থাকবে না। তেমনই মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষা লাভের উপায় মাত্র নয়।

৭) পড়ুয়ারা হয়ে উঠবে আত্মবিশ্বাসী, সহযোগী। তাদের মন হবে সক্রিয়, অনুসন্ধিৎসু। সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার বোধ তৈরি হবে এই স্কুলেই।

ন্যেরেরে গভীরভাবে বিশ্বাস রাখেন, উন্নয়ন রূপায়ণে বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনাকে উসকে দেওয়ার কাজ করে বয়স্ক শিক্ষা। ন্যেরেরে–এর মতে, বয়স্ক শিক্ষার বিষয়টি অনেকটাই রাজনৈতিক। এই শিক্ষার ভেতর দিয়ে ব্যক্তি নিজের পরিস্থিতিকে বিচার–বিশ্লেষণ করতে শেখে, তার মনে প্রশ্ন জাগে। অনুসন্ধান করতে করতে পরিস্থিতি পরিবর্তনের পথ, উত্তরণের পথ খুঁজে পায়। নিজস্ব ব্যক্তিগত উত্তরণের সাথে সাথে সমাজের উত্তরণের উপায় খুঁজে পায়। বয়স্ক শিক্ষাক্রমের পড়ুয়ারা নিজেরাই স্থির করবে তারা কী শিখবে। শিক্ষকের কাজ হবে শেখার পথে সঙ্গী হয়ে পথ দেখানো। শিক্ষা নিয়ে জুলিয়াস ন্যেরেরে-র অপূর্ব একটি উক্তি হল, "বেঁচে থাকাটাই শেখা। আর শেখা মানেই আরও ভালভাবে বেঁচে থাকা"।

তানজানিয়ার উন্নয়ন সমাজবাদের পথ ছেড়ে ধনতান্ত্রিক পথ ধরেছে বহুদিন ন্যেরেরে-র শিক্ষা নিয়ে। স্বপ্নগুলি কতক পূরণ হয়েছে, কতক হয়নি। যেটা হয়েছে, সেটা হল, তানজানিয়া জুড়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার। যার ফলে স্বাস্থ্য, কৃষি সংক্রান্ত খবরাখবর দেশের কোণায় কোণায় সহজেই পৌঁছে যায়। আর বয়স্ক শিক্ষায় তানজানিয়ার উদ্ভাবনী উন্নয়ন "বিপ্লবের" আখ্যা পেয়েছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত অ্যারিস্টটলের আরও কিছু উক্তি;-

"শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তেঁতো হলেও এর ফল মিষ্টি"

"হৃদয় শিক্ষিত না করে, মনকে শিক্ষিত করা মোটেই শিক্ষা নয়"

"জ্ঞানীরা ধন সঞ্চয় করেন অর্থ পিশাচদের মুখাপেক্ষী না হওয়ার জন্য"

"শিক্ষার লক্ষ্য হল, সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করা"

নবদিশার পথিকদের প্রতি আবেদন

নবদিশার পথিক হয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রথমেই অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে, এখনও পর্যন্ত নবদিশার ১১টি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নানান ত্রুটির কারণে হয়তো অনেক সংকলন আপনাদের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়েছে, হয়তো বা আদৌ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরজন্য আমরা আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থণা করছি। তবে আমরা মনে করি, এই ত্রুটিগুলো সংশোধন করার জন্য অবিলম্বে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। আপনাদের সাহায্য ছাড়া যা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। আগামী দিনে যাতে এই নবদিশার এই পথ আরও সুগম হয় তারজন্য আপনারদের সুচিন্তিত মতামতের পাশাপাশি যথা সময়ে পথিক হিসাবে নতুনভাবে ধার্য হওয়া আপনাদের নির্দিষ্ট গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে পুর্ননবীকরণে সহায়তা করুন। এবার থেকে ডাকযোগে এই গ্রাহকমূল্য বছরে ২০০ টাকা এবং হাতেহাতে আপনার এলাকার চিহ্নিত কোনও কেন্দ্রীয় জায়গা থেকে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে বছরে ১০০ টাকা গ্রাহকমূল্য দিতে হবে। শিক্ষাসংক্রান্ত আমাদের অন্য কোনও প্রকাশনা আত্মপ্রকাশ করলে তাও নবদিশার সংকলনের সঙ্গে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি নবদিশায় প্রকাশিত শিক্ষামূলক প্রবন্ধগুলো নিয়েও আপনাদের মতামত আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। আপনাদের উপযুক্ত মতামতের মাধ্যমেই নবদিশার পথে এগিয়ে চলা সম্ভব। তাই হবে আমাদের পথ চলার পাথেয়।

আশা করি, এক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সহযোগিতা পাব এবং নবদিশার পথে আমাদের যাত্রাপথ আগামীতে আরও সুগম হবে।

যে কোনও প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন এই নম্বরেঃ 9433152505, 9830453086

সম্পাদক, নবদিশা, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্, কলকাতা

এসো তাঁদের গল্প শোনাই

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন অসামান্য এক বাঙালি পদার্থ বিজ্ঞানী। কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এবিষয়ে তাঁর গবেষণা "বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিকস" এবং "বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট" তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে। মহান ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান অর্থাৎ কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে একটি নতুন দিক নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর রচনাগুলি মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দ্বারা প্রশংসিত হয় এবং তাঁরা একসঙ্গে বহু তত্ত্বের প্রস্তাব করেছিলেন। বহু বিজ্ঞানী এনিয়ে নিজেদের আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরষ্কারও লাভ করেছেন।

১৮৯৪ সালের ১ জানুয়ারি, কলকাতার ঈশ্বর মিত্র লেনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সুরেন্দ্রনাথ বসু পূর্ব-ভারত রেলওয়ের প্রকৌশল বিভাগে কর্মরত ছিলেন। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি বড় ছিলেন। সাধারণ একটি স্কুলে হয়েছিল তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। পরে ভর্তি হন নিউ ইন্ডিয়ান স্কুল এবং হিন্দু স্কুলে। স্কুল শেষে ভর্তি হন কলকাতার বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজে। তিনি সমস্ত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর এবং তিনি প্রথম স্থান অর্জন করতে থাকেন। তাঁর প্রতিভা দেখে প্রায়শই অনেকেই বলতেন, ভবিষ্যতে তিনি একজন মহান গণিতবিদ্ বা বিজ্ঞানী হয়ে উঠবেন। ২০ বছর বয়সে ঊষাবতীর সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের নয়টি সন্তান হলেও, দুর্ভাগ্যবশত এরমধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়।

> সত্যেন্দ্রনাথ বসু আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান অর্থাৎ কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে একটি নতুন দিকনির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর রচনাগুলি মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দ্বারা প্রশংসিত হয় এবং তাঁরা একসঙ্গে বহু তত্ত্বের প্রস্তাব করেছিলেন।

১৯১৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম. এস. সি. (গণিত) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। কলেজের অধ্যক্ষ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভা দেখে তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। ১৯১৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদেই ছিলেন। ১৯২১ সালে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের রিডার হিসাবে। পরে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। সময়টি ছিল পদার্থবিদ্যায় তাঁর নতুন আবিষ্কারের সময়। কোয়ান্টাম তত্ত্বটি জার্মান পদার্থবিদ্ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক উপস্থাপন করেছিলেন। জার্মানিতেই আইনস্টাইন "আপেক্ষিকতা তত্ত্ব" প্রস্তাব করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এই সমস্ত আবিষ্কার নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করছিলেন। কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের ভিত্তি নিয়ে একটি রচনা লিখে তা প্রকাশের জন্য ব্রিটিশ জার্নালে পাঠিয়েছিলেন। তবে তিনি ব্যর্থ হওয়ায় পরে তিনি তা সরাসরি আইনস্টাইনের কাছে পাঠান। আইনস্টাইন এর গুরুত্ব বুঝে তা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং Zeitschrift für Physik নামে জার্নালে প্রকাশ করেন। এরপরে এই দুই মহান বিজ্ঞানী একসঙ্গে অনেক গবেষণা করেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফিজিক্স জার্নালে প্রকাশের জন্য আরও একটি কাগজ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাও প্রকাশ না হওয়ায় পরে তা আবার আইনস্টাইনের কাছে পাঠান। আইনস্টাইন এবিষয়ে আরও কিছু গবেষণা করার সময় যৌথভাবে তা Zeitschrift für Physik পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই কাগজটি 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব' নামে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় একটি নতুন শাখার জন্ম দেয়। যার মাধ্যমে সব ধরনের বোসন কণার বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করা যায়। এরপরে ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন। যেখানে তিনি মেরি কুরি, পাওলি, হাইজেনবার্গ এবং প্ল্যাঙ্কের মতো বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করেন। বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিল। ইউরোপে প্রায় দু'বছর কাটিয়ে ১৯২৬ সালে তিনি ঢাকায় ফেরেন। আবেদন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে। পি. এইচ. ডি. না থাকায় প্রথমে তিনি ওই পদের যোগ্য বলে মনোনীত না হলেও পরে আইনস্টাইনের প্রশংসাধন্য হওয়ার সুবাদে তিনি কাজটি পান। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন এবং তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান ও এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি নিয়ে কাজ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। ১৯৫৬ সালে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে যান। তবে সেখানে বেশিদিন থাকেননি।

১৯৫৮ সালে ফিরে আসেন কলকাতায়। এবছর রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়ে তিনি জাতীয় অধ্যাপক হন। বিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর অবদানের জন্য ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করে। ৮০ বছর বয়সে ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সেই সময়

প্রায় দেড়শ বছর আগে A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্রন্থটি লিখেছিলেন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ। মোট ২০টি খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে তৎকালীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থান ও জেলার ভৌগোলিক বিবরণ সহ সেখানকার অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা ও তাদের আর্থ-সামাজিক চিত্র, নানা তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ যেভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে, তাতে তৎকালীন বাংলার জেলাভিত্তিক যে পরিচয় আমরা পাই – তা আজও প্রাসঙ্গিক। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যদি একবার সেই পুরনো দিনগুলির দিকে তাকাই, তাহলে বুঝতে পারব এখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখন দেখা যাক, কেমন ছিল সেই সময়।

নদিয়া

ভারতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের একটি জেলা। এই জেলার উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলা; পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশের খুলনা বিভাগ, দক্ষিণ-পূর্বে ও দক্ষিণে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা এবং পশ্চিমে হুগলি ও বর্ধমান জেলা অবস্থিত। ১৭৮৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে জেলা হিসেবে নদিয়ার আত্মপ্রকাশ। সে সময় বর্তমান হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সাময়িকভাবে এই জেলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিন দিন বাদে ১৮ আগস্ট কিয়দংশ বাদে নদিয়া পুনরায় ভারত অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি নদিয়া জেলা তার বর্তমান রূপটি লাভ করে। ১৯৪৭ সালে সাময়িকভাবে জেলার নামকরণ নবদ্বীপ করা হলেও কিছুদিনের মধ্যেই সেই নামকরণ বাতিল হয়। নদিয়া নামের উৎস সম্বন্ধে নানা ধারণা প্রচলিত আছে। নদিয়া ও নবদ্বীপ এই দুটি নামই এই জনপদে প্রচলিত। এই স্থান বহু বার বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হয়েছে, যার ফলে উচ্চারণের বিকৃতির মাধ্যমে নদিয়া ও নবদ্বীপ সম্পর্কযুক্ত হতে পারত, যদিও তা হয়নি। নদিয়ার নামকরণ প্রসঙ্গে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী একটি কিংবদন্তির উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ভাগীরথী তীরস্থ নবসৃস্ট চরভূমিতে এক তান্ত্রিক প্রতিদিন সন্ধ্যায় ন'টি প্রদীপ জ্বালিয়ে তন্ত্র-সাধানা করতেন। দূর থেকে দেখে লোকে এই দ্বীপটিকে ন'দিয়ার চর বলত। আর সেই থেকেই নাকি লোকমুখে 'নদিয়া' নামের প্রচলন করে।

ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় নদিয়া হিন্দু ধর্মালম্বিদের জন্য একটি তীর্থস্থান। রাজা বল্লাল সেন নদিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন বাংলার হিন্দু রাজারা গৌড়ের পাশাপাশি নদিয়াতেও অবস্থান করতেন। রাজা বল্লাল সেন তার শাসনকালে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভাগীরথী নদীতে তীর্থস্নান করার উদ্দেশ্যে আসতেন। তিনি এই নদীর তীরে পঞ্চরত্ন নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ ও ১৯৫৮ সালে ব্রিটিশ সরকার

কর্তৃক পরিচালিত ভূমি জরিপ ম্যাপে একই সময়ে খননকৃত একটি দীঘির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। নদিয়া জেলা ২২°৫৩' ও ২৪°১১' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০৯' ও ৮৮°৪৮' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা এই জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে পূর্বদিকে মাজদিয়ার সামান্য উত্তর দিয়ে পশ্চিমে চাপড়া, নবিননগর, মধুপুর, কৃষ্ণনগরের উত্তরে- ঘূর্নি, ঘূর্ণি গোডাউণ, কালিদহ, পাণিনালা, হরনগর, আনন্দনগর, ভক্তনগর, হাঁসাডাঙ্গা-বনগ্রাম, চৌগাছা, মায়াকোল, বাহাদুরপুরের উপর দিয়ে চলে গেছে। সেজন্য তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি (বা শীতকালে কম) থাকে এই সব জায়গা গুলিতে।

এই জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা, পশ্চিমে বর্ধমান ও হুগলি জেলা এবং পূর্বে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কুষ্টিয়া ও যশোহর অবস্থিত। জেলার স্বাভাবিক ভূমিঢাল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। তবে বর্তমান ভূমির ঢাল খুব কম এবং ঝিল, পুরনো নদীখাত ও জলাভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। জলঙ্গী ও চুর্নী নদীর প্রবাহপথ সর্পিল এবং স্থানে স্থানে তা অনেক বিল সৃষ্টির কারণ হয়েছে। এই নদীগুলির প্রবাহপথ ক্রমাগত পলি পড়ে পড়ে মজে এসেছে। এই কারণে বর্ষার সময় এখানে অনেক জায়গায় বন্যা হয়। নদিয়া জেলার জলবায়ু উষ্ণ আর্দ্র ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির। কর্কটক্রান্তি রেখা জেলার মাঝামাঝি দিয়ে যাওয়ায় গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম অনুভূত হয়।

জেলায় মূলত চারটি ঋতু দেখা যায়। যথা – গ্রীষ্মকাল (মার্চ-জুন), বর্ষাকাল (জুন-সেপ্টেম্বর), শরৎকাল (অক্টোবর-নভেম্বর) ও শীতকাল (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি)। গ্রীষ্মকালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় উষ্ণতা যথাক্রমে ৪৩° সেন্টিগ্রেট ও ১৯° সেন্টিগ্রেট। অন্যদিকে শীতকালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় উষ্ণতা যথাক্রমে ৩০° সেন্টিগ্রেট ও ০৯° সেন্টিগ্রেট। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২০০-১৪০০ মিলিমিটার। অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয় বর্ষাকালেই।

নদিয়া জেলার প্রধান নদনদীগুলি হল ভাগীরথী, জলঙ্গী, ভৈরব, চূর্ণী, মাথাভাঙা ও ইছামতী ইত্যাদি। এই জেলায় ভাগীরথীর দৈর্ঘ্য ১৮৭ কিলোমিটার। ভাগীরথীর বদ্বীপ প্রবাহে শেষ উপনদী হিসেবে যুক্ত হয়েছে মাথাভাঙা নদী। এরপর ভৈরব নদ ভাগীরথী থেকে নির্গত হয়ে জলঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আরও দক্ষিণে ভাগীরথী থেকে নির্গত হয়েছে জলঙ্গী নদী (দৈর্ঘ্য ২০৬ কিলোমিটার)। এই অংশ বর্তমানে পলি পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। জলঙ্গী নদী উত্তর-পশ্চিমাংশে নদিয়া-মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর জেলার মাঝখান দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়ে নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথী নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভৈরব নদ বর্তমানে মৃতপ্রায়। মাথাভাঙা (দৈর্ঘ্য ১৯ কিলোমিটার) উপনদীটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর পুনরায় ভারতে প্রবেশ করে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। পশ্চিম শাখাটি চূর্ণী (দৈর্ঘ্য ৫৩ কিলোমিটার) নামে পশ্চিমে ও পূর্ব শাখাটি ইছামতী (দৈর্ঘ্য ৬৮ কিলোমিটার) নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। নদিয়া জেলার নদীগুলি বারবার দিক ও গতি পরিবর্তন করে। বন্যা এখানকার নদীগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। নদীর প্রবাহ পরিবর্তনের ফলে জেলায় অনেক অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, জলাভূমি ও বিল গড়ে উঠেছে। নদিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য নদী ঝোড় নদী, যেটি ভীমপুরের উপর দিয়ে প্রবাহিত।

নদিয়া জেলার মাত্র ১.২২ হেক্টর জমিতে অরণ্য বর্তমান, যা জেলার মোট ভৌগোলিক আয়তনের মাত্র ০.৩১ শতাংশ। নদিয়া জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দু, যা মোট জনসংখ্যার ৭২.১৫%। এছাড়া অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইসলাম (২৬.৭৬%), খ্রিস্টান (০.৬৫%), শিখ (০.০২%), বৌদ্ধ (০.০১%), জৈন (০.০১)। এছাড়া অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসী ০.৩৩% মানুষ ও বিবৃতি নেই এমন মানুষ ০.০৭%।

মায়াপুরে সেনরাজা বল্লাল সেনের স্মৃতিসম্বলিত 'বল্লাল ঢিবি' বর্তমান। এখানকার বামনপুকুর বাজারে চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপ শাসক 'চাঁদকাজী'র সমাধি আছে। নবদ্বীপের পশ্চিমে পাড়ভাঙায় উঁচু ঢিবি বৌদ্ধস্তূপ হিসাবে চিহ্নিত, যা 'পাহাড়পুর' নামে খ্যাত। যোগীনাথতলা পাড়ায় হাত-পা হীন কূর্মাকৃতি পাথরখণ্ড 'বৌদ্ধ শূন্যবাদ'এর প্রতীক বলে স্বীকৃত। দণ্ডপাণিতলায় দ্বিভূজ দণ্ডপাণির মূর্তি হাঁস ও মড়ার মাথার খুলিসহ পূজিত হয়। এছাড়া আছে, ধর্মরাজ বুদ্ধের মূর্তি। এখানকার কিছু স্থানে শিবলিঙ্গের বদলে শিবের পাথুরে লোড়ামূর্তি পূজিত হয়; এদের কোনোটি 'বুদ্ধমূর্তি' বা প্রতীকচিহ্ন আঁকা মূর্তি। ভবতারণ শিবমন্দিরে একটি পাথরখণ্ডে পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্তি খোদিত আছে।

> ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সাময়িকভাবে এই জেলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিন দিন বাদে ১৮ আগস্ট কিয়দংশ বাদে নদিয়া পুনরায় ভারত অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি নদিয়া জেলা তার বর্তমান রূপটি লাভ করে।

এছাড়া, 'অ্যালানে শিব' বা 'আলোকনাথ শিব' পালযুগের বৌদ্ধসংস্কৃতির ধারাকে বহন করে আসছে। দিগনগরে নদিয়া রাজপরিবার-এর রাজা রাঘব রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'রাঘবেশ্বর শিবমন্দির' (১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) আছে। শিবনিবাসে তার প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বর, রাজ্ঞীশ্বর, ও রামচন্দ্র নামে তিনটি দেবমূর্তি আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়-এর সময় থেকে তার আদেশে নদিয়ায় বিশালাকারে দীপান্বিতা শ্যামাপূজার প্রবর্তন ঘটে। অগ্রদ্বীপে ঘোষঠাকুর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বর্তমান। চৈত্র একাদশীতে ঘোষঠাকুরের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বিশাল মেলা বসে। এছাড়া, রাস পূর্ণিমায় নবদ্বীপের শাক্তরাস একটি অভিনব আকর্ষণ। পোড়া-মা তলায় প্রাচীন দেবীপ্রতিমা অধিষ্ঠিতা। উলা-বীরনগরে উলাই চণ্ডী সাড়ম্বরে পূজিতা হন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বেশ কিছু 'বৈষ্ণব মন্দির' বর্তমান। বৈষ্ণব তিথি অনুসারে মন্দিরসমূহে উৎসব পালিত হয়। এর মধ্যে 'রাস-উৎসব' ও 'দোল-উৎসব' অন্যতম।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি .... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করব স্থির করেছিলুম, ইতিমধ্যে কোনো একটি আমেরিকান কাগজে এবিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়লুম; পড়ে খুশি হয়েছি। আমার মতটি এই লেখায় ঠিকমত ব্যক্ত হয়েছে। হবার প্রধান কারণ এই, আমেরিকা দীর্ঘকাল থেকে বৈষয়িক সিদ্ধির নেশায় মেতে ছিল। সেই সিদ্ধির আয়তন ছিল অতি স্থূল, তার লোভ ছিল প্রকাণ্ড মাপের। এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তার ফলে সামাজিক মানুষের যে পূর্ণতা সেটা চাপা পড়ে গিয়ে বৈষয়িক মানুষের কৃতিত্ব সব ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজ হঠাৎ সেই অতিকায় বৈষয়িক মানুষটি আপন সিদ্ধিপথের মাঝখানে অনেক দামের জটিল যানবাহনের চাকা ভেঙে, কল বিগড়িয়ে, ধুলায় কাত হয়ে পড়েছে। এখন তার ভাবনার কথা এই যে, সব ভাঙাচোরা বাদ দিয়ে মানুষটার বাকি রইল কী? এতকাল ধরে যা কিছুকে সে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছিল, তার প্রায় সমস্তই বাইরের। বাইরে যখন ভাঙন ধরে তখন ভিতরটাতে যদি দেখে সমস্ত ফাঁক তা হলে সান্ত্বনা পাবে কী নিয়ে? আসবাবগুলো গেল, কিন্তু মানুষটা কোথায়? সে এই বলে শোক করছে যে, সে আজ ভিক্ষুক; বলতে পারছে না ‘‘আমার অন্তরে সম্পদ আছে’। আজ তার মূল্য নেই; কেননা সে আপনাকে হাটের মানুষ ক’রে তুলেছিল, সেই হাট গেছে ভেঙে।

একদিন ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ তখন ধনলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না; কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা, অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। অবশ্য, তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক-পরমার্থিককে মিলিয়ে। সংস্কৃতির অভাব আছে অথচ দক্ষতা পুরোমাত্রায়, এমন খোঁড়া মানুষ চলেছিল বাইসিক্‌ল্ চড়ে। ভাবেনি কোনো চিন্তার কারণ আছে, এমন সময় বাইসিক্‌ল্ পড়ল ভেঙে। তখন বুঝল, বহুমূল্য যন্ত্রটার চেয়ে বিনা মূল্যের পায়ের দাম বেশি। যে মানুষ উপকরণ নিয়ে বড়াই করে সে জানে না আসলে সে কতই গরিব। বাইসিক্‌লের আদর কমাতে চাই নে, কিন্তু দুটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল ক’রে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।

যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-নিরপেক্ষ হয়ে কী ক’রে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায় এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরিবের মতোই ছিল জীবনযাত্রা, সেই গরিবিয়ানাকে লজ্জা করাই লজ্জাকর এ কথাটা তখন মনে ছিল। উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষা করা বা বিশেষভাবে সম্মান করাই যে কুশিক্ষা, এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে রেখেছিলুম।

বলা বাহুল্য, যে দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্‌ভূত সে কুৎসিত। কথায় আছে : শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। তেমনি বলা যায়, সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্য শিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জন ক’রে। সামর্থহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।

‘‘আমি সব পারি, সব পারব’ এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারে। ‘‘আমি সব জানি’ এই কথা বলবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎসুক হয় তো হোক, কিন্তু তার পরেও চরমের কথা ‘‘আমি সব পারি’। আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে, ‘‘আমি সব পারি, সব পারব।’ তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করার অন্ত নেই। এই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি, সেইজন্যে বহু শতাব্দী ধরে আমরা দৈবকর্তৃক প্রবঞ্চিত।

সুইডেনের বিখ্যাত ভূপর্যটক স্বেন হেডিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেক দিন পরে আবার আমি পড়েছিলুম। এশিয়ার দুর্গম মরুপ্রদেশে আবহতত্ত্ব পর্যবেক্ষণের উপায় করবার জন্যে তিনি দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই অধ্যবসায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে, ‘‘আমি সব জানব, সব পারব।’ এই পারবার শক্তি বলতে কি বোঝায় সে তাঁর বই পড়লে বোঝা যায়। আমরা কথায় কথায় ওদের বলে থাকি বস্তুতান্ত্রিক। আত্মার শক্তি যার এত প্রবল, যে জ্ঞান-অর্জনের জন্যে সে প্রাণকে তুচ্ছ করে, যার কিছুতে ভয় নেই, সাংঘাতিক বাধাকে সে স্বীকার করে না, দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনে যাকে পরাহত করতে পারে না–প্রাণপণ সাধনা এমন-কিছুর জন্যে যা আর্থিক নয়, জীবিকার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক নয়, বরঞ্চ বিপরীত–তাকে বলব বস্তুতান্ত্রিক ! আর, সে কথা বলবে আমাদের মতো দুর্বল আত্মা !

‘‘আমরা সব-কিছু পারব’ এই কথা সত্য ক’রে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে, এ কথা ভুললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক; পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্ত বিদ্যার চাপে এইসব চির-পঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী করে? উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী। আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার

হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব, দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয় : চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়। অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম চলছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন অবস্থা থাকা চাই।

এই কৃতিত্বশিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই-যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে। আমেরিকান লেখক এই কথাটারই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?

সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহার কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয়; সংস্কৃতিবান্ মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্বক নিজেকে প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জা বোধ করে। যা-কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে, ক্ষমা করতে পারে, মতবিরোধের বাধা ভেদ ক'রেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়, অন্যের সফলতাকে ঈর্ষা করাকে সে নিজের লাঘব বলেই জানে।

সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয়, পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশের বর্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্বল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখতে পাই। তাই বীভৎস কুৎসা আমাদের দেশে আয়জনক পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠেছে। তারস্বরে নিন্দা বিস্তার করে বাতাসকে বিষাক্ত করার অপরাধকে আমরা গ্রাহ্যই করি নে; একটু উপলক্ষ ঘটবা-মাত্র এই বীভৎসতাকে উদ্ভাবিত করার ও প্রশ্রয় দেবার লোক দলে দলে ভিড় করে আসে, ইতর হিংস্রতায় সমস্ত দেশ মারীগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ মেধার গুণে আমরা পড়া মুখস্থ করি। বি. এ., এম. এ. পাস করি; কিন্তু আত্মলাঘবকারী পরস্পরের সৌভাগ্যবিদ্বেষী নিন্দালোলুপ যে চরিত্রদৈন্য শুভকর্মে পরস্পর মিলিত হবার পথে পথে সচেষ্টভাবে কাঁটার বীজ বপন করে চলেছে, সকল প্রকার সদনুষ্ঠানকে জীর্ণ বিদীর্ণ করে দেবার জন্যে মহোল্লাসে উঠে পড়ে লেগেছে, সে কেবল সংস্কৃতির অভাবে মনুষ্যত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই সম্ভব হল। সকল কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহপূর্বক নিজেদেরকে অকৃতার্থ করে আজ বাঙালি সমস্ত পৃথিবীর কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। শিশুকাল থেকে এই ইতরতার বিষবীজ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মূলিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান লক্ষ হোক, এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে পরীক্ষা-পাসের জন্যে পড়া মুখস্ত করা নয়, মানুষের ইতিহাসে যা কিছু ভাল তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয়সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া। একদা আশ্রমে আমার কবিসহযোগী সতীশ রায় এই কাজ করতেন এবং আর একজন সহযোগী ছিলেন অজিত চক্রবর্তী। তেমন শিক্ষক নিঃসন্দেহ এখনো আমাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু রক্তপিপাসু পরীক্ষাদানবের কাছে শিশুদের মন বলি দিতে তাঁদের এত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় যে শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।

আমেরিকান লেখক সংস্কৃতির এই ফলশ্রুতি বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে ক'রে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।

একদিন দেখেছিলাম শান্তিনিকেতনের পথে গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল; আমার ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার করে দিলে। সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না; আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা আনুকূল্য তারা কর্তব্য বলে জ্ঞান করত। সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে। এ-সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই-সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতাম; তার পরে অনেক দিন তাদের অনেককে দেখি নি। আশা করি তারা নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়, অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিকমত যাচাই করতে জানে।

(মূল লেখার বানান অপরিবর্তিত রাখা হল)

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক শিক্ষিকার কথা

আগে একটি ঝুপড়ির মতো টিনের ঘর ছিল, তাতেই চলত পড়াশুনা ছেলেমেয়েদের। উত্তর দিকে বড়মাঠ, দক্ষিণে স্কুলের ঘর ঘেঁষা নিকাশি নালা, পূর্বে রয়েছে চা-বাগানের শ্রমিকদের যাতায়াতের রাস্তা আর পশ্চিম দিকে স্কুল ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে রয়েছে বস্তি। স্কুল সংলগ্ন এলাকায় যে প্রতিবেশীরা থাকেন তাদের মধ্যে কিছু রয়েছেন স্থানীয় আর কিছু রয়েছেন বাইরে থেকে আসা। এরা আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু হলেও এদের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। স্কুলবাড়ির চারদিকে কোনও দেওয়াল নেই, তাই স্কুল ছুটির পর ঘরের বারান্দায় বসে চলে তাস খেলা আর মদ্যপান আসর। এমনকি অনেক সময় স্কুল চলাকালীনও স্কুলের মাঝখান দিয়ে হাতে জলের জ্যারিকেন নিয়ে শৌচকর্মে যান অনেকেই। এমন কিছু সচেতনতার অভাবে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ক্ষুদে পড়ুয়াদের অনেক সময় লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয়। আর একারণেই প্রতিদিন সকালে শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুল পরিষ্কার করে তবেই ছেলেমেয়েদের পাঠদান শুরু করেন। স্কুল লাগোয়া পরিবারগুলির অধিকাংশেরই স্বাস্থ্যসম্মত কোনও শৌচাগার নেই। শৌচকর্মের জন্য তারা অনেকেই স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত

নিকাশি নালাটিকেই বেছে নেন। স্থানীয় মানুষজনের ধারণা স্কুল আর নিকাশি নালা, দুটোই সরকারি সম্পত্তি। তাই নিকাশি নালা সংলগ্ন স্কুল প্রাঙ্গনেও তারা আর্বজনা ফেলে রাখেন। যার ফলে স্কুল চলাকালীন শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো তো দূরের কথা, কখনও ঘরে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অসুবিধার কথা অনেককে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। স্কুলটি চা-বাগানের জমিতে তৈরি হয়েছে তাই অনেক কাজ সহজে করা সম্ভব হয় না। স্কুলে কোনও কাজ করতে গেলেই প্রয়োজন হয় চা-বাগান কতৃপক্ষের অনুমতি। যা সকলের পক্ষে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া অনেকে এই দৌড়ঝাপ পছন্দও করেন না।

দীর্ঘ সময় ধরে স্কুলের অবস্থা যেমনই হোক না কেন পূর্ববর্তী অনেক শিক্ষকই এই দৌঁড়ঝাপ এড়িয়ে গেছেন। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হওয়ার ফলে স্কুলে ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কমতে থাকে। এই অবস্থার মধ্যেই নতুন একজন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পান। যিনি কাজে যোগ দিয়ে প্রথমেই নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে স্কুলের স্বার্থে একযোগে কাজ করার পরিবেশ গড়ে তোলেন। প্রতিজ্ঞা করেন স্কুলে ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাদানের সুস্থ পরিবেশ তৈরি করার। অন্যান্য শিক্ষিক-শিক্ষিকাদের নিয়ে মিটিং করে স্কুলের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও প্রশ্ন ছিল কীভাবে এই কাজ সম্ভব? কারণ সব শিক্ষকরাই তো আসেন আলিপুরদুয়ার থেকে? তাই প্রধান শিক্ষিকা নিজের কাঁধেই এই গুরু দায়িত্ব তুলে নেন। নিজেই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে স্কুলের পাশের ওই নিকাশি নালার পাশে বসে থাকতেন। পরে ন'টার সময় বাড়ি ফিরে গিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে আবার স্কুলে আসতেন। বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সামান্য কিছু খেয়ে আবারও স্কুলে গিয়ে বসে থাকা। সন্ধ্যায় স্কুলে যেন কোনও অসামাজিক আসর না বসে। প্রধান

শিক্ষিকার এই ভূমিকা দেখে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা আর একটু তাড়াতাড়ি স্কুলে আসতে শুরু করেন। এতে কিছুটা সুফল মিললেও স্থায়ী সমাধান কিন্তু ছিল পাকা দেওয়াল তৈরি। তবে স্কুলের চারপাশে দেওয়াল দিতে হলে ৪-৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তাই কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, এস. আই., বি.ডি.ও. সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বাউন্ডারি ওয়ালের জন্য আবেদন করা হয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি স্কুলের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের নিয়ে ঘনঘন আলোচনা শুরু হয়। স্কুলের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগও নেওয়া হয়।

দীর্ঘদিন পর যেটুকু সরকারি অনুদান পাওয়া যায় তা দিয়ে স্কুলে বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করা সম্ভব ছিল না। তাই এই অনুদান আসার পর পুনরায় অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সঙ্গে আলোচনায় বসা হয় এবং তাদের সামনে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। আলোচনার পর অভিভাবক-অভিভাবিকারা সিদ্ধান্ত নেন যে, তারা

সবাই মিলে এই কাজ করবেন। যেমন কথা তেমন কাজ। প্রথমে তারা নিজেদের সাধ্যমতো টাকা দিতে শুরু করেন, অনেকে আবার শ্রমও দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে এই উদ্যোগে এগিয়ে আসলেন এলাকার বেশ কিছু উদ্যোগী সাধারণ মানুষও। এইভাবে সকলের সহযোগিতায় স্কুলের দেওয়াল সহ গেট তৈরির কাজ আজ প্রায় শেষের মুখে। তবে এই কাজে স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সহযোগিতাকে শুধু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ক্ষান্ত থাকলে চলবে না, স্কুলে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের এই অবদানের কথা সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে। যাতে অন্য কোনও স্কুলেও এভাবেই শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে সবাই এগিয়ে আসেন। আর তবেই তাদের প্রতি যথার্থ সম্মান জানানো হবে।

অসচেতনতার বশবর্তী হয়ে অনেকেই যে কোনও কাজের কৃতিত্ব নিজে নেওয়ার চেষ্টা করেন। অন্যদের সহযগিতার কথা গোপন করে বলেন, 'আমি নিজেই সব কাজ করি'। কিন্তু কালচিনি ১ নং টি জি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শিপ্রা চক্রবর্তীর গলায় এমনটা যেন বেমানান। তাঁর কথায়, 'আমার স্কুলের সহকর্মীদের সহযোগিতা ছাড়া আমার একার পক্ষে কাজগুলি করা কখনই সম্ভব হত না'। পাশাপাশি তাঁর এই যাবতীয় কাজের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা-সংস্কৃতি-তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শ্রী প্রেম লামাকে। যিনি স্কুলের হাল ফেরাতে শিপ্রাদেবীকে বিভিন্ন সময়ে সর্বতভাবে সহায়তা করেছেন।

স্কুলের এই প্রধান শিক্ষিকা সকলকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে গ্রামের প্রান্তিক মানুষগুলিকে অবহেলা না করে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলে অনেক কিছুই করা যায়। স্কুলের উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা যে কোনও উদ্যোগ গ্রহণের আগে প্রথমেই তিনি অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিক্ষা সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা: একজন মানুষের দূরদর্শীতার দলিল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শোনেননি এমন একজন বাঙালি খুঁজে পাওয়া বিরল। দুই বাংলাতেই সমান জনপ্রিয় তিনি। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ মূলত ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজকর্ম। রাজা রামমোহন রায় যে শিক্ষা সংস্কারের সূচনা করেছিলেন তাকেই আরও অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলায় আধুনিক সমাজ তৈরির পথিকৃৎ যদি রাজা রামমোহন রায় হয়ে থাকেন, তবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার পিছনে মূল কাণ্ডারী ছিলেন তিনি। সে সময় বাংলার সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে ছিল। অন্যদিকে ইউরোপে তখন শিক্ষা ও শিল্পবিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে তখন তারা ব্যস্ত। এদিকে বাংলা তখন ছিল ইংরেজদের অধীনে। ইংরেজরা তখন এই দেশের মানুষদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে এবং বাংলাকে লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলার মানুষদের প্রতি তাদের কোনও আগ্রহ ছিল না। একটা দেশ এবং দেশের মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়ার মতো সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল ইংরেজরা। এরকম সময় যদি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার মানুষদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কাজ না করতেন তাহলে আমাদের এই সমাজ আরও কয়েক দশক পিছিয়ে যেত একথা বলাই বাহুল্য। শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কী পরিমাণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন আজ তা নিয়েই আলোচনা করা হবে।

বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন বহুভাষাবিদ্। বাংলার সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি এমনভাবে সাজাতে চেয়েছিলেন যেন বাংলার প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁকে নিয়োজিত করা হয়। সেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি সেখানকার প্রশাসন এবং শিক্ষায়তনিক দিকে যে সকল পরিবর্তন আনেন সেগুলি এর আগে আর কেউ কখনও করেননি। তাঁর প্রস্তাবিত এবং প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি জায়গা পেয়েছে তা হল সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা। সংস্কৃত কলেজে থাকাকালীন তিনি এমন একটি কাজ করে বসেন যার জন্য লৌহসম মানসিকতার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি খণ্ডনের। তিনি সংস্কৃত কলেজ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। কোনও ধর্ম, জাতিবিদ্বেষ এবং কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতাদর্শের ব্যক্তিত্বের জন্য সেখানে পড়াশোনা করতে বা যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাঁধা ছিল না। উনিশ শতকের সময় বাংলায় এধরনের কাজকে নাস্তিকতা এবং 'ব্লাসফেমি' বলে গণ্য করা হত। ঈশ্বরকে নিয়ে যারা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন তাদেরকে 'ব্লাসফেমি' বলা হয়। তিনিই প্রথম সংস্কৃত কলেজে ভর্তির ফি এবং শিখন ফি নেওয়া শুরু করেন। ক্লাসে সঠিক সময়ে উপস্থিতি এবং নিয়মানুবর্তিতার উপর কঠোরভাবে জোর দেন, প্রথম সাপ্তাহিক ছুটির প্রচলনও করেন তিনি। এসময় তিনি সংস্কৃত পড়াশোনায় কিছু পরিবর্তন আনেন। আগে সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করতে হলে চার-পাঁচ বছর সংস্কৃত ব্যাকরণ 'মুগ্ধবোধ' পড়তে হত। বিদ্যাসাগর এই কলেজে যোগ দেওয়ার পর সংস্কৃতকে বাংলায় রূপান্তরিত করেন এবং সেগুলিকে পাঠ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, শিক্ষার্থীরা যেন সংস্কৃতে লেখা যে কোনও বিষয় সহজেই নির্বাচন করতে পারে এবং পছন্দ অনুযায়ী পড়তে পারে। তিনি পরীক্ষা নেওয়ার প্রচলনও শুরু করেন। শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার দিকেই যে তাঁর লক্ষ্য ছিল এমনটা নয়। তিনি ইংরেজি, পশ্চিমী বিজ্ঞান এবং গণিত শিক্ষার প্রতিও মনোনিবেশ করেন। বিদ্যাসাগরের ভর্তি ফি এবং শিখন ফি নেওয়ারও বেশ কিছু কারণ ছিল।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, সরকার বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায়। যেমন সরকারি, বেসরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত। এসব প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে সরকারের অর্থের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেওয়া যায় তাহলে প্রতিষ্ঠান চালাতে সুবিধা হয়। সরকারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান করার লক্ষ্যে তিনি এই কাজ শুরু করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসিক পরীক্ষা নেওয়া শুরু করাও তাঁর আরও একটি দূরদর্শিতার নজির। বর্তমান সময়ে কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে Continuous Comprehensive Evaluation বা সার্বক্ষণিক মূল্যায়নের যে পদ্ধতি দেখা যায় তাই তিনি শুরু করেছিলেন দুশো বছর আগে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বছরে একটিমাত্র পরীক্ষা না নিয়ে সারা বছরই যদি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয় তাহলে সারা বছর শিক্ষার্থীরা পড়ার মধ্যেই থাকবে। উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে যে পড়াশোনার গুরুত্ব বোঝা জরুরি, সেটা তিনি আগেভাগেই বুঝে গিয়েছিলেন। তাই পড়াশোনার ক্ষেত্রে তিনি এতটা সংস্কার করার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন জনহিতকর ব্যক্তি। তিনি শুধু তাঁর নিজের সংস্কৃত

কলেজের উন্নতির জন্যই যে কাজ করেছেন এমন কিন্তু নয়। তাঁর কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সরকার তাঁকে বাংলার বিভিন্ন স্কুলের ইন্সপেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করে। ইন্সপেক্টর বা পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি চারটি জেলায় প্রায় বিশটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শুধু স্কুলই প্রতিষ্ঠা করেননি, বরং সেগুলির তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব নেন, আধুনিক সিলেবাস তৈরি করে দেন এবং শিক্ষকদের নিয়োগ করার জন্যও তাঁর ডাক পড়ত। শুধুমাত্র নতুন আঙ্গিকে পুরো শিক্ষার প্রেক্ষাপট তৈরি করেই তিনি থেমে থাকেননি। শিক্ষকদেরকেও তৈরি করেছেন তিনি। কারণ তিনি জানতেন, যারা এই নতুন আঙ্গিকে গড়া সিলেবাস পড়াবেন তারা নিজেরাও এরকম শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আগে পরিচিত ছিলেন না। তাই তাদেরকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করতে তিনি প্রতিটি স্কুলের সঙ্গে নর্মাল স্কুল বলে আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুপারিশ করেন, যাতে শিক্ষকদেরকেও প্রস্তুত করা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু শিক্ষা প্রসারেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। শিক্ষার্থীদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পড়াশোনা করা এবং সেই পড়াশোনাকে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এই ব্যাপারটিকে তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছেন। তাই পাস করে যাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের জন্য যেন কাজের ব্যবস্থা এবং সুযোগ তৈরি করা হয় সে ব্যাপারে সরকারের কাছে সুপারিশ করেন এবং অনেকটা সফলও হন। মেয়েদের পড়াশোনা নিয়েও বিদ্যাসাগরের মাথায় চিন্তা ছিল। তিনি জানতেন, সমাজে আদর্শ শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হলে নারী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেন, যাকে পরবর্তীতে বেথুন কলেজ নামে নামকরণ করা হয়।

নারীদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে তিনি একটি অর্থায়নের ব্যবস্থা করেন, যা নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল। যেখান থেকেই মেয়েদের শিক্ষার জন্য যাবতীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হত। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানুষ হিসেবে কতটা এগিয়ে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নিজে শিক্ষিত হয়েছেন এবং অপরকে শিক্ষিত করে তোলার কাজ অর্থাৎ শিক্ষকতাকেও পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার জন্য তিনি ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে গিয়েছেন। পড়াশোনার গুরুত্ব সবাইকে বোঝানোর জন্য এবং একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার জন্য তিনি আজীবন কাজ করেছেন। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে যে, কোথাও পড়ানোর জন্য বইয়ের ব্যবস্থা নেই, তিনি নিজের পয়সা খরচ করে সেখানে বইয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বারেবারে অগ্রাধিকার পেয়েছে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলা।

> এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভাল হয়।
>
> ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

নতুন শিক্ষানীতি এবং বিদ্যালয় শিক্ষায় নতুন দিগন্তের সন্ধানে

নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'নতুন শিক্ষনীতির' খসড়া। বিদ্যালয় শিক্ষার প্রেক্ষিতে প্রধান প্রধান প্রস্তাবনাগুলি নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব;-

১) কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকা বিদ্যালয়গুলিকে একত্রিত করে সুসংহত বিদ্যলয় করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের যাতে অসুবিধা না হয় তারজন্য বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিকে যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিমধ্যে গুজরাট, ছত্তিসগর, রাজস্থানে এই কাজ শুরু হয়েছে।

২) শিক্ষকদের দক্ষতামান আরও বাড়াতে প্রস্তাব এসেছে ৪ বছরের সুসংহত BA/BSC/B.ED-এর পাঠক্রম শুরুর। দুর্গম এলাকাগুলিতে যাতে শিক্ষক পাওয়া যায় সেজন্য নীতি প্রণেতা... DIET-এর পাঠক্রমকে নতুন করে সাজানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

৩) শিক্ষকদের জন্য প্রতি ৫ বছরে ২ মাসের জন্য Vacation training-এর ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

৪) SCERT এবং DIET এবং সেই সূত্র ধরে PRO-CRO গুলির পুনরুজ্জীবনের কথা বলা হয়েছে।

৫) দেশে আগামী সময়ে বিদ্যালয় প্রশাসন খুব জরুরি একটি স্থান নিতে চলেছে। সেজন্য বিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ে নতুন ভাবনা এসেছে, যে বিদ্যালয় প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য প্রয়োজন দ্বৈত-প্রক্রিয়া। এজন্য বিদ্যালয় অধ্যক্ষ নামে একটি নতুন Cadre তৈরির বিষয়ে ভাবা হয়েছে।

৬) বিদ্যালয়গুলিকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে আরও SMART করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৭) খুব বৈপ্লবিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে RTE আইনের ১২ (১) (C) ধারা নিয়ে। নীতি...... বলেছেন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণির জন্য সমস্ত বিদ্যালয়, এমনকি সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিও খুলে দেওয়ার কথা ভাবতে হবে।

৮) বিদ্যালয়স্তরে পাস-ফেল প্রথা নিয়ে সব জায়গার মতো নীতি প্রণেতাগণও আলোচনা করেছেন। প্রাথমিক স্তরে পাস-ফেল চালু না করে বলা হয়েছে উচ্চ-প্রাথমিক স্তর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য।

৯) শুধু পাস-ফেল নয় CCE প্রক্রিয়া যাতে আরও জোরদার করা যায় সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মানোন্নয়নে এই CCE আরও শক্তিশালী করে তোলার কথা বলা হয়েছে।

১০) নতুন শিক্ষানীতিতে RTE সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। বিশেষত, বেসরকারি বিদ্যালয়ের জন্য যেমন নিয়ম প্রয়োগ করা হয় তেমন সরকারি বিদ্যালয়গুলির ... দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া প্রয়োজন।

১১) Vocational Education নিয়ে সুগভীর আলোচনা হয়েছে এই শিক্ষানীতিতে। Vocation Education-এর সমগ্র প্রক্রিয়াটি যাতে মূল ধারার academic system-এর অংশ হতে পারে তার প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে।

১২) ICT @ School programme-এর অংশ হিসেবে যেসব বিদ্যালয়ে computer দেওয়া হয়েছিল সেখানে vocational training আরও জোর দিয়ে করার জন্য বিদ্যালয়ের ছুটির পরের সময়টিকে বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১৩) যে বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত জমি আছে সেখানে ...... তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। NSDC প্রশিক্ষণ সহযোগীদের একাজে লাগানো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪) ক্লাস এইটের পর থেকে যাতে ...... এর পাঠক্রমগুলি করানো যায় তারজন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের কথা বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

১৫) গভীর আলোচনা হয়েছে প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে। বলা হয়েছে, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলি শুধু খেলাধূলার জন্য নয়, বরং প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ রচনার জায়গাও বটে।

১৬) গ্রাম ভারতে অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলি যাতে প্রতিকী বিদ্যাল্যয়ে পরিণত হয় সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। কারণ তাতে common facility গুলি সবাই পাবে।

১৭) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি এই নীতিপত্র খুব গুরুত্ব দিয়েছে। এখানে State school Act-এর মধ্যে একটি Nodal ..... তৈরির কথা বলা হয়েছে।

১৮) আদিবাসী জনসমাজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ জোর দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আদিবাসীদের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করার জন্য TDD'-র হাত থেকে দায়িত্ব শিক্ষা দফতরকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১৯) আশ্রম বিদ্যালয়গুলিকে স্থানীয় কোনও ভাল বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

২০) আদিবাসী সমাজে শিক্ষার্থীদের দক্ষতামান বৃদ্ধির ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২১) শরীর শিক্ষার প্রেক্ষিতে যোগা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষত যেখানে খেলার মাঠ নেই সেখানে 'যোগ' সাধনার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

২২) পাঠক্রমের পরিবর্তন এবং পুনর্ভাবনার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, NCF- 2005 যাতে ভালভাবে প্রয়োগ করা যায় তার দিকে নজর দিতে হবে। এনিয়ে পৌরসমাজে অনেক আলোচনা চলছে।

২৩) বলা হয়েছে, পরীক্ষা ব্যবস্থা যেন শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

নয়া শিক্ষানীতি (২০১৯)ঃ এক বিহঙ্গ দৃষ্টি আলোচনা

দিব্যগোপাল ঘটক

গত কয়েক মাসে জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১৯) নিয়ে কম তর্ক বিতর্ক হয় নি। এখানে বিতর্ক যতটা নীতি নিয়ে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে। ফলে অনেকে নীতিটি বস্তু-নিষ্ঠ অরাজনৈতিক সমালোচনার পরিবর্তে ব্যক্তিনির্ভর আশঙ্কা কিম্বা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে ফেলেছেন।

ফলে এযাবৎ নীতিটির সঠিক মূল্যায়ন হয় নি। কোনো সরকারের সদিচ্ছার অভাবে কোনো গৃহীত নীতির ব্যর্থতার উদাহরণ ভারতে কম নেই। কিছুটা 'অবিশ্বাসের সাময়িক নিরোধ' (Suspension of disbelief) এর মাধ্যমে গৃহীত নীতির প্রাথমিক বিচার অবশ্যই জরুরী। ঐ দিকটি মাথায় রেখে সীমিত পরিসরে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ও রাজনীতি-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নীতিটিকে বিচার করার চেষ্টা করব। সাথে সাথে আমার আলোচনার বিস্তৃতি বিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

প্রথমতঃ জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১৯) কোনো অজ্ঞাত-পূর্ব অভিনব দলিল নয়। এটি বিগত শিক্ষানীতিগুলির ক্রমবহমানতার আঙ্গিকেই রচিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সরকারের ব্যবস্থাপনায় পূর্বতন শিক্ষানীতিগুলি অনুমোদিত হলেও, ঐ শিক্ষানীতিগুলির সাথে ২০১৯ এর নীতিটির মূলসুর একই রয়েছেঃ

. শিশুর কল্যাণ ও তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ . শিশুর স্বাধিকারের প্রতি সম্মানবোধ . বিকেন্দ্রীকৃত শিক্ষা-শাসন ব্যবস্থা . জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-বর্ণ-ভাষা ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে সাম্যাবস্থা (equity) রচনায় গুরুত্ব আরোপ . শিক্ষা পরিচালনায় শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কর্মী বাহিনী . গুণগত মানের শিক্ষার সুনিশ্চতকরণ . ভাষা শিক্ষায় জোর এবং ত্রিভাষা সূত্র . সক্রিয় বিদ্যালয় গুচ্ছের পরিকাঠামো গড়ে তোলা . শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ঢেলে সাজানো . শিক্ষায় ব্যাপক প্রযুক্তির প্রয়োগ . মূল্যায়নে বোধ, প্রয়োগ ও সংশ্লেষণের সামর্থ্যে জোর এবং স্মৃতির উপর চাপ কমানো। . বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

শুধুমাত্র তিনটি মূল ভাবনার অতিরিক্ত সংযোজন ঘটেছেঃ

(ক) তিন বছরের প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকে বিদ্যালয় ব্যবস্থার মূল স্রোতে যুক্ত করা (খ) ৩ থেকে ১৮ বছরের শিশু কিশোরদেরকে শিক্ষার অধিকার আইনের অধীনে আনা এবং চারটি বিশেষ ধাপে বিভক্ত করে শিক্ষা পরিচালনা সুনির্দিষ্ট করা (গ) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের প্রথাগত শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে একটি বিমিশ্রিত পাঠক্রমের সূচনা।

এই নীতিটিতে সার্বিকভাবে যে দিকগুলি চিহ্নিত হয়েছে তা হলঃ

১) সাক্ষরতা ও গাণিতিক ধারণার সুনিশ্চিতকরণঃ

মিড'ডে-মিল বা ছাত্র শিক্ষক অনুপাতকে ৩০:১ এ নামিয়ে আনার মত কয়েকটি সুপারিশ সহ এখানে তিনটি নতুন সুপারিশ আছে। (ক) জাতীয় গৃহ-শিক্ষক কর্মসূচি (খ) সঙ্গীশিখন ও ঘাটতি পূরণের জন্য লোকালয় শিক্ষকের নিযুক্তি (গ) স্থানীয় সমাজসেবী ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে শিশু কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করণ। এখানে সমাজের অংশগ্রহণের নামে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের আশঙ্কার কথাও কম নয়। সম্ভাবনা প্রবল। এব্যাপারে সরকারকে সুনির্দিষ্ট দিশাপত্র তৈরি করতে হবে।

২) নতুন পাঠক্রম ও শিক্ষা-কাঠামোয় মনো-বিজ্ঞান সম্মত ধাপ তৈরিঃ

(ক) পূর্বতন ১২ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার পরিবর্তে ১৫ বছরের শিক্ষাকাঠামো নির্মাণ ও তদনুরূপ পাঠক্রম তৈরি।

. ৩-৮ বছরের ভিত্তিধাপ (দ্রুত মস্তিস্ক গঠনের স্বার্থে আবিস্কার মূলক শিক্ষা) . ৮-১১ বছররের প্রস্তুতিধাপ (পরিকল্পিত পাঠক্রমে প্রবেশের জন্য আনন্দদায়ক ও অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন) . ১১-১৪ বছররের মধ্যস্তরীয় ধাপ (বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পিত পাঠক্রম ও বয়ঃসন্ধির শিক্ষা) . ১৪-১৮ বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ধাপ (জীবিকা ও উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি ও প্রাপ্ত বয়স্ক জীবনের প্রস্তুতি)

(খ) ৮ম শ্রেনি পর্যন্ত সহপাঠক্রমিক ও পাঠক্রম- অতিরিক্ত বিষয়গুলি নিয়ে একটি নমনীয় ও সুসংবদ্ধ পাঠক্রম তৈরি করা যাতে মাধ্যমিক স্তরে নিজস্ব আগ্রহের বিষয় নির্বাচন করা সহজ হয়।

(গ) ভাষার ব্যুৎপত্তি, বিজ্ঞানসম্মত বিচারক্ষমতা, নান্দনিকবোধ, নৈতিক বিচারবোধ, ডিজিটাল সাক্ষরতা, ভারতবর্ষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ধারনা এবং চলমান ঘটনাক্রমের চর্চায় জোর রেখে নতুন জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (২০২০) প্রকাশের উদ্যোগ।

(ঘ) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী থেকেই শিক্ষক নিয়োগ এবং অন্তরভূর্ক্তিমূলক শিক্ষায় জোর। শহুরে দরিদ্র শিশুদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা।

৩) বিদ্যালয়ে অন্তভূর্ক্তি করণ ও পনেরো বছর ব্যবস্থায় ধরে রাখার সার্বজনীন উদ্যোগ ৪) ২০২৫ এর মধ্যে ৩-৬ বছরের সব শিশু বিদ্যালয় শিক্ষা সুনিশ্চিত করা ৫) প্রারম্ভিক স্তরে মাতৃভাষায় জোর। তা সত্ত্বেও প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকেই একাধিক ভাষা শিখনের সুযোগবৃদ্ধি। মাধ্যমিকে বিদেশীভাষাকে ঐচ্ছিক করে দেওয়া এবং ত্রিভাষা সূত্রের প্রয়োগে সংস্কৃত সহ আরও ৮টি ক্যাসিকাল ভাষার উপর জোর। ৬) আংশিক শিক্ষক নিয়োগ রদ করা, শিক্ষক প্রশিক্ষনে জোর, আদর্শ শিক্ষক তৈরিতে চার বছরের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা, শিক্ষকদের চাহিদা অনুসারে মডিউল ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। ৭) শিক্ষা প্রশাসনে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্তি এবং বিদ্যালয়গুচ্ছের (school complex) ধারণার প্রয়োগ। ৮) 'লোক বিদ্যা' ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিবর্তন করা এবং অন্তত ৫০% শিক্ষার্থীকে

এর আওতায় আনা ৯) শিক্ষনে, শিখনে, মূল্যায়নে, শিক্ষক-প্রশিক্ষনে, প্রান্তিক শিক্ষার্থী জন্য শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক প্রযুক্তির ব্যবহার সুনিশ্চিত করা ১০) জীবনব্যাপী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখে প্রথা বহির্ভূত বয়স্ক শিক্ষায় জোর।

উপরের এই দশটি দিক পর্যালোচনা করলে বাহ্যতঃ মনে হতে পারে নীতিটি একেবারেই ত্রুটিমুক্ত এবং সার্বিক।

তবু স্বাগত জানানোর আগে সর্বস্তরে ব্যাপক আলোচনা হওয়া দরকার এই নীতিটি বাস্তবায়িত করাতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই মুক্তমনে উপযুক্ত নির্দেশ জারি করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ তৃণমূলস্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে সর্বস্তরে যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে তা হলঃ

(ক) প্রাক-প্রাথমিক স্তর বা মস্তিষ্কগঠন ও আত্ম প্রস্তুতির প্রথম ধাপটিকে শিক্ষকেরা যাতে পঠন পাঠনের কেন্দ্রে পরিণত না করে ফেলে তাঁর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। (খ) দেশীয় ভাষা শিক্ষায় জোর দিতে গিয়ে ইংরাজি শিক্ষার মান নষ্ট করা উচিৎ হবে না। অন্যদিকে সংস্কৃতকে সর্বাধিক মান্যতা দেওয়াও বন্ধ করতে হবে। (গ) বিদ্যালয়গুচ্ছকে একটি স্বাধীন, স্বয়ংক্রিয় ও দায়িত্বশীল মঞ্চ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। (ঘ) বৃত্তি শিক্ষায় জোর দিতে গিয়ে সাধারণ শিক্ষার মান হ্রাস করা যাবে না। (ঙ) লোকালয় শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে- এব্যাপারে সবাকে সচেতন থাকতে হবে।

নৈতিক শিক্ষা

সাধারণভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা হল বিদ্যালয়ে যাওয়া, বই পড়া এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা তা নয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু গুণ আছে, যা শৈশবে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। শিক্ষা এক বিশেষ পন্থা, যার সাহায্যে মানুষের ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত হয় ও ফলস্বরূপ তার বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে। মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ প্রয়োজনীয় হলেও এক্ষেত্রে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শিক্ষার অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন ও নৈতিক জীবনযাপনে মানুষকে সাহায্য করা, যার ফলে তার নৈতিক বিকাশ সম্ভব। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষা প্রণালী ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার কারণ সুস্পষ্ট।

বর্তমান যুগের আগে পর্যন্ত নৈতিকতা ধর্মেরই তত্ত্বাবধানে ছিল এবং সর্বত্র তার শিক্ষাও ধর্মের মাধ্যমেই দেওয়া হত। বিদ্যালয় পাঠক্রম থেকে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতাও বহির্ভূত হল। এর কারণ হচ্ছে, ধর্মের যেমন অত্যাবশ্যক, সার্বজনীন ও শাশ্বত উপাদান রয়েছে তেমনই সংস্কার, সামাজিক প্রথা, পুরাণ, মতবাদ ইত্যাদি কিছু সীমিত, পার্থিব উপাদানও ধর্মের আয়ত্তাধীন। এধরনের অনেক উপাদানের সঙ্গে বিজ্ঞান এবং আধুনিক সামাজিক চিন্তাধারার সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবে ধর্মীয় বিবাদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি মূলত এধরনের অনাবশ্যক উপাদান থেকেই উদ্ভুত হয়। তাই ধর্মের এই উপদানগুলিকেই প্রকৃত ধর্ম ভেবে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে তাকে বহির্ভূত করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই পদ্ধতিতে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের চিরন্তন সত্য অপসৃত হয়েছে।নৈতিক তত্ত্বের নিছক শিক্ষা দেওয়াই কিন্তু যথেষ্ট নয়। কারণ যুবসমাজের কাছে এধরনের শিক্ষা অবাঞ্ছিত উপদেশের সমতুল্য। বস্তুত, ইচ্ছাশক্তি,

বিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থপরতা এই ব্যক্তিগত গুণসমূহের বিকাশের মাধ্যমেই নৈতিকতা বাস্তবায়িত হয়। মানুষে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য নৈতিক শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক শক্তি বলতে 'ইচ্ছাশক্তি'-কে বোঝায় এবং সেটা হল আত্মিক শক্তি। এই শক্তিকে অবলম্বন করেই সর্বদা নৈতিক পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

কেবলমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সকল পরিস্থিতিতেই নীতিপরায়ন থাকতে পারেন। শুধু দুর্বলচিত্তের মানুষই প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। সকল পাপ ও অন্যায় কাজ 'দুর্বলতা' শব্দটির মধ্যে নিহিত আছে। দুর্বলতাই সকল অন্যায় কাজের উৎস; দুর্বলতাই অপরকে আঘাত দিতে মানুষকে প্ররোচিত করে, দুর্বলতাই তাদের প্রকৃত রূপ থেকে ভিন্ন রূপে বিকশিত করে। আত্মিক শক্তি কীভাবে অর্জন করা যায়, সে বিষয়ে মনে একটি প্রশ্ন উঠে। সমাধান-বিশ্বাসের মাধ্যমে। এখানে বিশ্বাস বলতে নিজের উপরে বিশ্বাসের কথাই বলা হয়েছে। এখানে নিজের উপর বলতে আত্মাকে বোঝানো হয়েছে, অহংকারকে নয়। আত্মা চির-পবিত্র, চির-মুক্ত ও অমর এবং আমাদের অন্তরতর সকল শক্তির উৎস। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, নিজেকে শিখাও, প্রত্যেককে তার প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে শিখাও; নিদ্রিত আত্মাকে আহ্বান করো এবং কীভাবে জেগে উঠে দেখ। যখন নিদ্রিত আত্মা জেগে উঠে আত্মসচেতন করে দেয় তখন শক্তি, সম্মান এবং যা কিছু উত্তম তা অর্জন করা যায়। নিজের উপর বিশ্বাস রাখার কথা বলা হয়েছে। নিজের উপর বিশ্বাস এবং সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস প্রায় সমার্থক।

সৃষ্টিকর্তা আমাদের অন্তরেই বিরাজ করেন। তিনি পরমাত্মা। নিজের প্রকৃত সত্তা বা আত্মার উপর বিশ্বাস পোষণ করা সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাসী হওয়াকে বোঝায়। বিভিন্ন নীতিগ্রন্থে নিঃস্বার্থপরতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে নিঃস্বার্থপরতাই নৈতিকতার একমাত্র পরীক্ষা। নৈতিকতার একমাত্র সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে: স্বার্থপর হলেই তা অনৈতিক এবং নিঃস্বার্থপর অর্থেই নৈতিক। নিঃস্বার্থপরতা আমাদের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে দেখাতে হবে।শৈশব থেকেই এই গুণকে উদ্দীপ্ত করা সম্ভব। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের শেখানো উচিত যে, স্বার্থপর কর্মের তুলনায় নিঃস্বার্থ কর্ম অধিক সুখপ্রদ। দুঃস্থের সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন নিঃস্বার্থ কর্মে তাদের অংশগ্রহণ করতে যথার্থ শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সমাজের দারিদ্র্যতা ও অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ তীব্র স্বার্থপরতা। দেশের হিতে অবশ্যই আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থপরতা প্রয়োজনীয় বিষয়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য যে, আত্মিক সত্তাই মানুষের মৌলিক প্রকৃতি এবং সেটা অনুভব করতে সক্ষম না হলে দীর্ঘস্থায়ী সুখ অথবা শান্তি কখনও লাভ করা যায় না।

সকল মানুষের মধ্যেই পরম সত্য বা সৃষ্টিকর্তাকে জানার আগ্রহ থাকে এবং এজন্য সে ওই লাইনে কাজ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের পরে পরিশেষে মানুষ সকল সুখ ও শক্তির উৎস হিসেবে আত্মিক সত্তাকে তার মনের মধ্যেই আবিষ্কার করে। এখানেই আধ্যত্মিক বিকাশের সূচনা। সকল ধর্মের পরম লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক বিকাশ, সর্বোচ্চ শান্তি ও পূর্ণতা। মহাপুরুষরা সব ধর্মের বাস্তব অনুশীলন করে সর্বপ্রথম এই মহান সত্য উন্মোচিত করেন। তাঁরা দেখালেন যে, ধর্মের পারস্পারিক বিবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের অনাবশ্যক উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে। এই সত্যের অনুধাবন এবং সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে পরিগণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সর্ব ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব রাখা এবং সব ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে শান্তিতে থাকার ক্ষমতা অর্জন করা উচিত। তাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য সত্যিকারের শিক্ষাদান করতে ধর্মকে শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে গণ্য করতে হবে, শিক্ষা প্রথাগত বা প্রথাবহির্ভূত নির্বিশেষে। মানুষের ব্যক্তিত্বের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের অভাবে বর্তমান বিশ্ব সংকটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাই ধর্ম শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হলে মানবজাতির কল্যাণ ত্বরান্বিত হবে। এখন সহজেই অনুভব করা যায়, বিজ্ঞানের সুবাদে অলৌকিক উন্নতিবিধান হলেও সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছেন।

সময় এবং অবস্থান বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের চরম ধারণা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্যে সজাগ হয়েছে। হাইজেনবার্গ তাঁর অনিশ্চয়তা নীতির মাধ্যমে লক্ষ্য করলেন যে, মানুষের জ্ঞান সীমিত। পদার্থবিদ্ নিলস্ বোর বলেছেন: অস্তিত্বের মহান নাটকে আমরা একাধারে দর্শক এবং অভিনেতা। তাই বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে পদার্থের উর্ধ্বে উচ্চতর নৈতিকতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। এরফলে পদার্থবিদ্‌রা এখন মন এবং চেতনা নিয়ে গবেষণা করছেন। বর্তমানে অনেক বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন যে, মন এবং পদার্থের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই প্রাচ্য ধর্মের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে একথা যেমন সত্য, তেমনই জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা অনুরূপভাবে প্রযোজ্য। পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানের নিরিখে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ফ্রয়েড এবং অন্যান্য প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের পেছনে ফেলে এক্ষেত্রেও তার অগ্রগতি অব্যাহত-সৃষ্টি হয়েছে 'ট্রান্সপার্সোনাল মনোবিজ্ঞান।' বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞানীরা চেতনার পরিবর্তিত অবস্থার, পরম অভিজ্ঞতার কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন, যা সবই কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতারই ভিন্ন নাম।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানবসম্পদের প্রকৃত উন্নতি করা বিজ্ঞানের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে ধর্মবিযুক্তভাবে শুধু বিজ্ঞানের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করার জন্য মানবিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাই, মানবসম্পদের প্রকৃত বিকাশের জন্য ধর্ম এবং বিজ্ঞানের পরিপূরক ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে তা বলা বাহুল্য।

লেখকঃ সাংবাদিক-কলামিস্ট

প্রকৃতি আমাদের শেখায়, প্রকৃতি আমাদের বাঁচায়

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

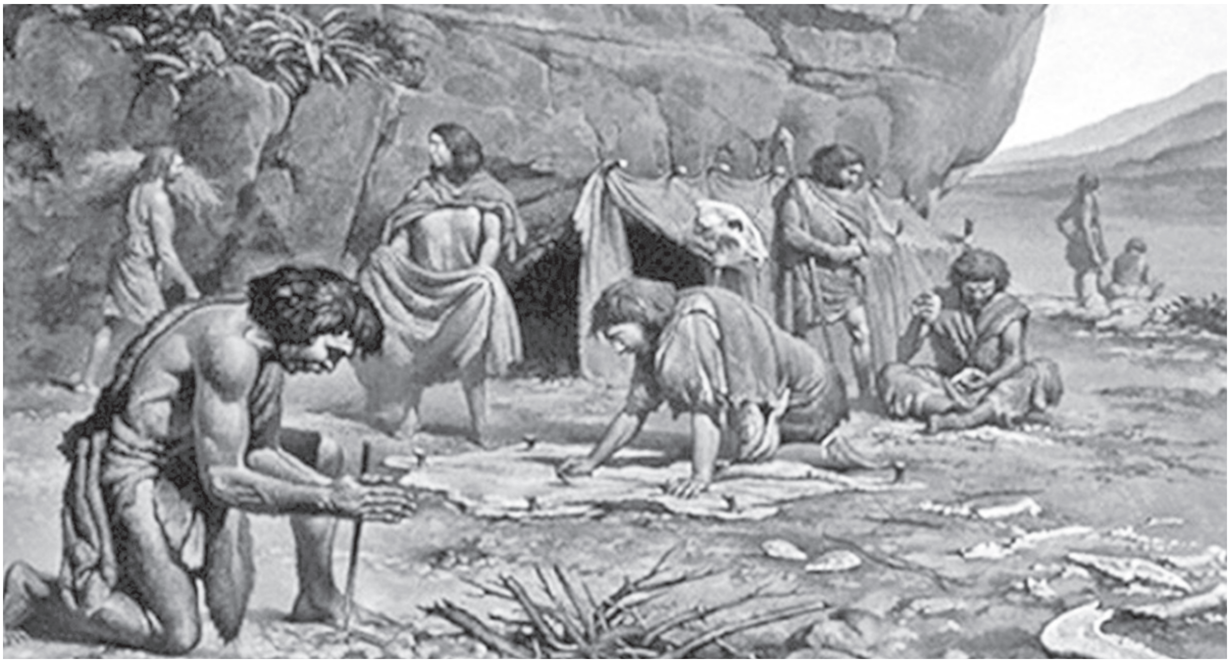

মানুষ আজ অহংকারী। শিক্ষার দৌড়ে সে সবাইকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। এখন সে নিজের শিক্ষাব্যবস্থা নিজেই ঠিক করে নেয়। প্রকৃতিকে করে অস্বীকার। অথচ গুহাবাসী মানুষ একদিন প্রকৃতির কাছ থেকেই শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতির নিয়মগুলি তখন সে মেনে চলত। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে যতই সে শিক্ষিত হয়েছে ততই সে নিয়ম ভাঙার খেলায় মেতে উঠেছে।

শিক্ষা সম্পূর্ণ তখনই হয়, যখন তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উভয় শিক্ষাই লাভ করা যায়। আমাদের বই সর্বস্ব শিক্ষা শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষাই দিতে পারে, প্রায়োগিক শিক্ষা নয়। প্রায়োগিক শিক্ষা পূর্ণ হয় প্রকৃতি শিক্ষায়। এদিক থেকে বিচার করলে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ।

প্রকৃতির কাছে মানুষ শিক্ষা পেতে পারে দু'ভাবে, প্রকৃতির নিজের উপাদান অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছপালা, আকাশ-বাতাস প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এবং প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত তারই অপর সন্তান পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গের মাধ্যমে। এখন দেখা যাক, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মানুষ কীভাবে প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা পেতে পারে।

ছেলেবেলাতেই আমরা শিখেছি, 'একবারে না পারিলে দেখ শতবার'। এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে রবার্ট ব্রুস ও মাকড়সার কথা। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ব্রুস যখন এক গুহায় আশ্রয় নেন, হতাশা যখন তাঁকে গ্রাস করেছে, তখনই তিনি দেখতে পান মাকড়সাটিকে। পরপর সাতবার চেষ্টার পর আটবারের বার মাকড়সাটি গুহার সিলিং-এ পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। এই ঘটনা থেকেই ব্রুস শিক্ষা পেয়েছিলেন, যে বারবার চেষ্টা করলে সফলতা এক সময় আসবেই। অধ্যবসায়ের এই শিক্ষা আমরা কীট-পতঙ্গের কাছ থেকেই পেয়ে থাকি। শুধু মানুষের নয়, সমগ্র জীবজগতেরই দৈহিক শক্তির সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু যখন দেখি অতি ক্ষুদ্র আকারের পিঁপড়ে তার দেহের ওজনের চেয়ে প্রায় ৫২ গুণ বেশি ওজনের কোনও বস্তু নিয়ে দিব্যি চলাফেরা করছে, অথবা যখন দেখি গুবরে পোকার মতো অতি সাধারণ এক পোকা তার শরীরের ওজনের প্রায় ৮৫০ গুণ ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন কি আমরা আমাদের দৈহিক শক্তির সীমাবদ্ধতাকে জয় করার প্রেরণা পাইনা ?

দূর-দূরান্তে বার্তা প্রেরণের জন্য একসময় আমরা পায়রার সাহায্য নিতাম। সংবাদ প্রেরণের পর প্রাপকের কাছে সংবাদ পৌঁছনোর ব্যাপারে আমরা একরকম নিশ্চিন্তই থাকতাম। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পায়রাও ডাক হরকরার কাজটি সঠিকভাবেই পালন করত। এমনকি নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে সঠিক জায়গায় সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করত। ১৯১৭ সালে এরকমই একটি ঘটনার কথা শোনা যায়। পায়রাটি যখন খবর নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রওনা দেয় তখন জার্মানদের ছুটে আসা একটি গুলিতে তার একটি পা উড়ে যায়। শুধু তাই নয়। চিঠির কৌটোটি বুলেটের আঘাতে তার পেটের মধ্যে ঢুকে যায়। গুরুতর

আহত পায়রাটি সেই অবস্থায় অতি কষ্টে ৯ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে চিঠিটি পৌঁছে দেয় প্রাপকের কাছে। এই কর্তব্যবোধের শিক্ষা পায়রাটি পেয়েছিল কার কাছ থেকে ? নিশ্চয় মানুষের কাছ থেকে নয় ? মানুষের কর্তব্যবোধ তো এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। বরং মানুষেরই এখন উচিত এইসব পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গের কাছ থেকে নতুন করে কর্তব্যবোধের পাঠ গ্রহণ করা।

স্থাপত্য শিল্পে পশু-পাখি এমনকি কীট-পতঙ্গরাও যে উৎকর্ষের পরিচয় দেয় তা দেখে অবাক হতে হয়। বাবুই পাখিকে বাসা বানানোর জন্য আলাদা করে কোনও প্রযুক্তিবিদ্যা শিখতে হয় না। সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই সে শিখে নেয় বাসা বানানোর প্রয়োগ কৌশল। শুধু বাবুই পাখি কেন, অন্যান্য অনেক পশু-পাখি এমনকি পিঁপড়েরাও জানে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর বাসা বানানোর প্রযুক্তি। এইসব প্রাণীদের অনেকেই মানুষের আগে পৃথিবীতে এসেছে। গুহাবাসী মানুষ কি এদের কাছ থেকেই বাসা বানানোর প্রেরণা পেয়েছিল ?

নির্দিষ্ট উষ্ণতা প্রয়োজন মতো ধরে রাখার জন্য আমরা ইনকিউবেটর ব্যবহার করি। মনুষ্য জীবনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে হালে আমরা এই যন্ত্রটি তৈরি করেছি। অথচ অস্ট্রেলিয়ার ম্যালি ফাউল (এক ধরনের মুরগি জাতীয় পাখি) বহুকাল ধরেই এক ধরনের প্রাকৃতিক ইনকিউবেটরের সাহেয্যে ডিম ফুটিয়ে আসছে। পুরুষ ম্যালি ফাউলের জড়ো করা ঘাস-জঙ্গল-লতা-পাতার স্তুপের মধ্যে স্ত্রী-পাখিটি ডিম পাড়লে পুরুষ পাখিটি তা বালি দিয়ে ঢেকে দেয়। কিছুদিন পরে বালির নীচের উদ্ভিজ্জ পচে গিয়ে তাপ সৃষ্টি করে। এই তাপই ডিমে তা দেওয়ার কাজটি করে। ম্যালি ফাউলের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে অনেক সময় লাগে। তাই প্রাকৃতিক ইনকিউবেটরের তাপ নির্দিষ্ট মাত্রায় আছে কিনা দেখার জন্য পুরুষ পাখিটি মাঝে মাঝে বালির মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে নেয়। প্রয়োজনে কখনও বালি সরিয়ে, কখনও বালির স্তর পুরু করে সে প্রাকৃতিক ইনকিউবেটরের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখে। নিঃসন্দেহে এটি এক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যে পদ্ধতিতে গণিত শেখানো হয় তাতে শিশু মনের গাণিতিক বিকাশ কতখানি হয় তা নিয়ে সন্দেহ আছে। সঠিকভাবে উপস্থাপনার অভাবে বিষয়টি শিশুদের কাছে নীরস হয়ে পড়ে। ফলে বেশিরভাগ শিশুর কাছেই গণিত শিক্ষণ দুরূহ ও ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তাদের অবচেতন মনে বিষয়টির প্রতি বিরাগ জন্মায়। অথচ প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে যদি বিষয়টি শেখানোর চেষ্টা করা হয় তবে ছোটদের কাছে গণিত শেখাটা বিড়ম্বনার বিষয় হয়ে উঠবে না। গণিতের একটি শাখা হল 'জ্যামিতি'। জ্যামিতি-বিষয়ক চিত্রসমূহ প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু ফল, ফুল, উদ্ভিদের মধ্যেই নয়, পশু-পাখির মধ্যেও ছড়িয়ে আছে এই চিত্রভান্ডার। আনারসের গা থেকে 'ত্রিভুজের' ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এর সারা দেহে যে দাগ (চোখ নামে পরিচিত) থাকে তা ত্রিভুজাকৃতির। নারকেল গাছের পাতা থেকে সমান্তরাল সরলরেখার ধারণা করা আদৌ দুরূহ ব্যাপার নয়। 'বৃত্তের' ছবি পাওয়া যায় পূর্ণিমার চাঁদে। তরমুজ আর গোলকের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়াটা কি খুবই কঠিন কাজ ? মোচার অগ্রভাগ থেকে 'কোণ', কলাগাছ (থোর) থেকে 'চোঙ', নারকেল পাতার কাঠি থেকে 'সরলরেখা'র ধারণা কি আমরা পেতে পারি না ? এরকম আরও বহু উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে প্রাকৃতিক ভাণ্ডারে। অনিসন্ধিৎসু চোখে সেগুলি শুধু খুঁজে নিতে হবে আমাদের। প্রকৃতি শিক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিশুকে গণিত শেখালে সেই শিক্ষাই হবে প্রকৃত শিক্ষা।

গান গাওয়ার বাসনা বোধহয় সব মানুষেরই থাকে। কিন্তু সবাই গাইতে পারে না। এরজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। গান গাওয়ার জন্য পাখিদের আলাদা কোনও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত এইসব পাখির দল জন্ম থেকেই পায় সুরেলা কণ্ঠ। সেই কণ্ঠ দিয়ে যে সুর বের হয় তা একেবারে নিঁখুত। যেসব পাখি দেখতে সুন্দর তাদের তালিকায় কোকিলকে স্থান দেওয়া যায় না। কিন্তু বসন্ত ঋতুতে সে যখন পঞ্চম সুরে কুহুতান তোলে তখন তার জায়গা হয় আমাদের মনের মণিকোঠায়। অতি বড় গায়কও তখন তার এই সুরেলা কণ্ঠের তারিফ না করে পারেন না। শোনা যায়, আমাদের সঙ্গীতের সপ্তসুরের উৎপত্তিই নাকি পশু-পাখির কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ থেকে।

নাচের ক্ষেত্রেও আমরা প্রকৃতির কাছে শিক্ষার্থী। পেখম মেলে ময়ূর যখন নাচে তখন সেই নাচ আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করে, যে কথা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। বিজ্ঞানী গোপাল ভট্টাচার্যের লেখা থেকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের একটি সারসের নৃত্যের কথা আমরা জানতে পারি। সারসটি নাকি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাঙ্গনে একটি ফুল নিয়ে প্রতিদিনই নানা ভঙ্গিমায় নাচত। কখনও শুয়ে, কখনও লাফিয়ে, কখনও বা ডানা মেলে চলত তার এই অদ্ভুত নাচ। পাখিদের নানা ধরনের নাচ দেখেই কি আমরা অতীতে নৃত্যকলা শেখার প্রেরণা পেয়েছিলাম?

রঙ আমাদের কার না ভাল লাগে ? অঙ্গসজ্জা, গৃহসজ্জা, রূপচর্চা ইত্যাদি সব কছুতেই থাকে রঙের ছোঁয়া। চিত্রকরের ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে কল্পনা আর রঙের সংমিশ্রণে। একাধিক রঙের মিশ্রণে তারা ফুটিয়ে তোলে অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তন (shade)। তবুও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, সত্যিই কি আমরা আজও পেরেছি প্রকৃতির মতন এত রঙের বৈচিত্র্যকে আয়ত্ব করতে ? তবে কেন আমরা আজও বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি বিচিত্র রঙের প্রজাপতির দিকে ? কৃত্রিম ফুল সরিয়ে রেখে কেন আমরা ছুটে যাই প্রাকৃতিক ফুলের আকর্ষণে? পাখির শরীরের পালকের রঙের বৈচিত্র্য আমরা কি পারি নিঁখুতভাবে আমাদের ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে ? আমরা পারি কি রামধনুকে নিঁখুতভাবে আঁকতে ? রঙের প্রলেপে প্রাকৃতিক ফুলের কমনীয়তা ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে এখনও আমাদের শিখতে হবে অনেক। রঙের খেলাতেও প্রকৃতির কাছে এখনও আমরা শিক্ষার্থী।

খেলাধূলার ক্ষেত্রেও প্রকৃতি আমাদের শিক্ষাগুরু। হাঁস বা পানকৌড়ির সাঁতার কাটাই হয়তো আমাদের সাঁতার শেখার প্রেরণা জুগিয়েছে। হরিণ, ক্যাঙারু বা কয়ার ফড়িংয়ের উলম্ফ

দেখেই হয়তো আমরা ক্রীড়াসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছি লং-জাম্প, হাই-জাম্প ইত্যাদি ক্রীড়া। হনুমান বা বানরের ঝুলন্ত অবস্থায় গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ানো বা এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দিয়ে যাওয়ার সঙ্গে আমাদের জিমন্যাস্টিক ক্রীড়ার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইদানিং নৃত্যকলা শুধু ডাঙাতেই হয় না, জলে নৃত্য করার কৌশলও মানুষ আয়ত্ব করেছে। এর প্রেরণা যদি ডলফিনের কাছ থেকে আমরা পেয়ে থাকি তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আকাশে ওড়ার বাসনা তো পাখিদের দেখেই হয়েছিল আমাদের ? খুঁজলে হয়তো এরকম আরও অনেক উপমা পাওয়া যাবে যা আমাদের আরও অনেক নতুন নতুন ক্রীড়ার খোঁজ দিতে পারে।

পিঁপড়ের কাছে আমাদের শেখার শেষ নেই। ওদের মতো শৃঙ্খলাবোধ যদি আমাদের থাকত, তবে আমাদের জীবনের ধারাটাই পাল্টে যেত। একান্নবর্তী পরিবার কী করে রক্ষা করতে হয় তা ওদের কাছে শিক্ষণীয়। এব্যাপারে মৌমাছির নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে কীভাবে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার কৌশল এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলির বুদ্ধিতে আসল কী করে তা ভাবলে অবাক লাগে। বর্ষাকালে যখন এদের বাসা জলে ভেসে যায় তখন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এরা একসঙ্গে জড়াজড়ি করে গোল বলের মতো দলা পাকিয়ে জলের উপর ভাসতে থাকে। সেই অবস্থায় ভাসতে ভাসতে কোনও উঁচু জায়গা পেলে অথবা জল কমে গেলে এরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। ওদের দেখে শত্রু-মিত্র ভুলে গিয়ে আমরাও কি যৌথভাবে বিপদের মোকাবিলা করতে পারি না ?

সব মায়েরাই চায় তাদের সন্তানেরা কখনও যেন কোনও বিপদে না পড়ে। 'প্রকৃতি-মা'ও তাই চায়। তাই তার সন্তানদের সুরক্ষার জন্য সে সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ুতে আছে পরিমাণ মতো অক্সিজেন। অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজনীয় অনুপাত ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হয়েছিল পর্যাপ্ত বনাঞ্চল। নির্বিচারে গাছ কেটে এবং বনাঞ্চল ধ্বংস করে আমরা সেই অনুপাত রক্ষায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছি। পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বায়ুতে অবস্থিত ওজোনস্তর ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করছে। পৃথিবীতে ডাঙার চেয়ে জলের পরিমাণ অনেক বেশি। সমুদ্রগুলিতে সঞ্চিত এই বিপুল জলরাশি নষ্ট হয়ে আমাদের অস্তিত্বকে যাতে বিপন্ন না করে তোলে সেই জন্য প্রাকৃতিক নিয়মেই এতে পর্যাপ্ত লবণ মেশানো রয়েছে। এই জলরাশিরই কিয়দংশ সূর্যের প্রখর তাপে বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে মেঘ সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে সেই মেঘ থেকেই বৃষ্টির আকারে ধরিত্রীর বুকে নেমে আসে সুস্বাদু জলধারা, যা আমাদের প্রাণ ধারণের জন্য একান্তই প্রয়োজন।

প্রকৃতির দেওয়া এই 'রক্ষাকবচ' বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের। প্রকৃতির তৈরি নিয়ম-নীতি মেনে চললে একে রক্ষা করা আদৌ কোনও সমস্যা নয়। মানুষ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সন্তানদের নিয়ে প্রকৃতির কোনও মাথাব্যথা নেই। কারণ তারা প্রকৃতি-জননীর সমস্ত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এমনকি অরণ্যের মানুষেরাও এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে, প্রকৃতির বিপর্যয় মানে নিজেদের বিপর্যয়। এই সহজ সরল সত্যটা বুঝতে পারিনি শুধু আমরা, যারা আধুনিক কৃত্রিম শিক্ষার অহংকারে প্রকৃতির নিয়মগুলিকে মানতে অস্বীকার করি। নিজেদের ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রকৃতির অঙ্গে অনবরত 'দূষণ' নামক ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছি। প্রকৃতির সারা অঙ্গে আজ এই ক্ষত।

অবাধ্য সন্তানকে সঠিক পথে আনার জন্য মা যেমন মাঝে মাঝে তাকে শাসন করেন, 'প্রকৃতি-মা'ও তার অবাধ্য সন্তান মানুষকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শাসন করার চেষ্টা করে। 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বা 'ওজোনস্তরে ফুটো' মানুষেরই অসংযত ক্রিয়াকলাপের ফল। এখনও সাবধান না হলে মানুষ নিজের কবর নিজেই খুঁড়বে। প্রকৃতি চায় না তার প্রবর্তিত নিয়মগুলি মানুষ প্রতিনিয়ত বদলে দিক। বরং সে চায়, তার নিয়মগুলি মেনে এবং তার সঙ্গে সহযোগিতা করে মানুষ তার ভবিষ্যতকে আনন্দময় করে তুলুক।

আর ভুল নয়। প্রকৃতি যে পাঠদানের ব্যবস্থা করে রেখেছে তাকে গ্রহণ করে প্রকৃতি মাকে রক্ষা করার শপথ নিই। আগামী দিনের স্লোগান হোক, 'প্রকৃতি শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা'।

প্রথম প্রকাশঃ শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান (২০০২)

"শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য- ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০ ০৩১ থেকে প্রকাশিত ও শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

নবদিশার পথিকের প্রতিক্রিয়া

তারিখঃ______________________

নামঃ______________________________ দূরভাষঃ______________________

ঠিকানাঃ____

পেশাঃ____

স্কুলের নামঃ____

(যদি প্রযোজ্য হয়)

নবদিশার গুণগত মানঃ	ভাল	☐	খুব ভাল	☐	মাঝারি	☐	খারাপ	☐
নবদিশার বিষয়ঃ	প্রাসঙ্গিক	☐	অপ্রাসঙ্গিক	☐				
সৃজনশীলতাঃ	ভাল	☐	খুব ভাল	☐	মাঝারি	☐	খারাপ	☐
প্রচ্ছদঃ	ভাল	☐	খুব ভাল	☐	মাঝারি	☐	খারাপ	☐
লেখা দিতে ইচ্ছুকঃ	হ্যাঁ	☐	না	☐				

গুণগত মান নিয়ে মতামতঃ____

____

____

____

(অনুগ্রহ করে ফর্মটি কেটে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠানঃ
অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্‌, ৩২/৬ গড়িয়াহাট রোড (সাউথ)
কলকাতা - ৭০০০৩১

____
স্বাক্ষর

নবদিশা

নবদিশার ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য অবদানের দিশারী হবে।

নবদিশার পথিক হন

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার খোঁজে শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন তাঁদের চিন্তা – অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মঞ্চ হল এই নবদিশা পত্রিকা।

আমরা আশা করি আপনাদের মতামত, শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাধারণ পাঠক্রমের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা নবদিশা পত্রিকার মাধ্যমে বিনিময় হবে।

জানার জন্য, শেখার জন্য ও জানানোর জন্য।

আসুন, পথিক হন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০ ০৩১, টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯